ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯, মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(কুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৫ তম বর্ষ ■ ৭ম সংখ্যা ■ দামোদর ৫৩৫ ■ নভেম্বর ২০২১

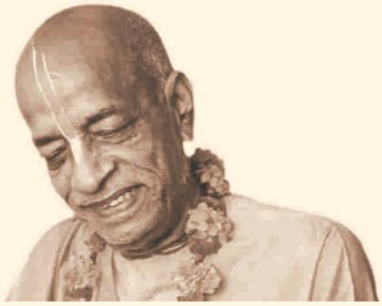

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

বিশ্ব খাদ্য সরবরাহ

"সমস্ত প্রাণীরা অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করে, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে।"

এই কারণেই আমরা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের এই আন্দোলনের সূচনা করেছি। এটি হলো সংকীর্তন যজ্ঞ।

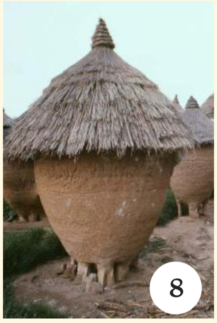

৪

৬ আচার্য বাণী

পরম সৌভাগ্যবতী মা যশোদা

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ যদিও কামনা শূন্য তবুও তিনি ভক্তের আনন্দ বিধানার্থে সকালবেলা স্তন্যপানের কামনাযুক্ত হয়ে মা যশোদার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন তার বাৎসল্য, প্রীতি, আনন্দকে বর্ধিত করার জন্য।

৭

১২

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ

ভগবদ্গীতায় দেবোপাসনা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কি বক্তব্য?

তাই কৃষ্ণভক্তদের আলাদা করে দেবোপাসনা করার দরকার নেই। আমরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন লীলাতে দেখতে পাই যে তিনি ইন্দ্রপূজার অনুমোদন দেননি। সেই লীলাতে আমরা এও দেখতে পাই যে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব স্বয়ং তার ভুলের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

ভগবান ভক্তকে আরও বিশেষ কৃপা করেন—ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে হৃদয়ের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করেন এবং উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন।

১৬

১৭ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

শ্রীমতি কুন্তীদেবী ভাল করেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করছেন, পরমহংসদেব মুনিদের কাছে ভক্তিযোগ বিতরণ বিকশিত করতে আপনি অবতীর্ণ হন।

২৩ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী গোলোকবাসী ভক্তগণেরও বিচিত্র মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। গোলোকে কোটি কোটি বালক, তরুণ ও বয়স্ক গোপগণ বাস করেন। পরন্তু, তাঁরা সকলেই মনে করেন যে, আমিই শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রিয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই মতো ব্যবহারও করে থাকেন।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

দামোদর লীলার মাহাত্ম্য

মা যশোদাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণকে আরও ভালোভাবে সেবা প্রদান করার জন্য সেই দুধের সংরক্ষণ করা বিশেষ ভাবে দরকার। তিনি তাই কৃষ্ণকে তাঁর কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে সেই উথলে উঠা দুধকে বাঁচাতে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রেগে গেলেন।

২৫

২৮

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

ভক্তদের মধ্যে হিংসা অহংকার কেন?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

রাজস্থানী আটার লাড্ডু রাজস্থানী কাঞ্জী বড়া

২০ ইসকন সমাচার

দুর্গাপুর ইসকনে ঝুলন যাত্রা মহোৎসব

২৯ ছোটদের আসর

প্রহারেণ ধনঞ্জয়

৩১ ভক্তি কবিতা

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

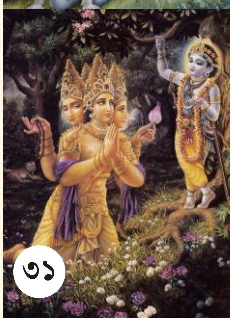

৩১

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের হৃদয়ে আবদ্ধ করতে পারি

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ হলেন আকর্ষণের মূল কেন্দ্র, তিনি হলেন ব্রজবাসীগণের মন ও প্রাণ। তারা সমস্ত কিছুই করেন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। শ্রীকৃষ্ণও সমস্ত কিছু করেন ব্রজবাসীদের আনন্দ দানের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা করেন। তিনি সর্বদাই তার পুত্রের যথাযথ খাদ্য, যথাযথ সাজসজ্জা এবং সমস্ত বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য উদগ্রীব থাকেন এবং নিশ্চিত করেন।

একদা মা যশোদা দধি মন্থনকালে যখন কৃষ্ণ ক্ষুধার্থ হন তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য থেকে বিরত হয়ে শিশুপুত্রকে স্তন্যপান করালেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সমস্ত জীবের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণ করেন কিন্তু এই স্থানে মাতা যশোদা ক্ষুধার্থ কৃষ্ণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করছেন। অন্যদিকে চুল্লীতে এক পাত্র দুধ গরম হচ্ছিল এবং সেই ফুটন্ত দুধ যখন দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তখন সে অভিমান এবং দুঃখে হতাশ হয়ে ফুলতে ফুলতে ঝরে পড়তে শুরু করে। চিন্ময় জগতে দুগ্ধও চেতন বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান গোলোক বৃন্দাবনে সমস্ত কিছুই চেতন বস্তু এবং প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রদানে সর্বদা উদগ্রীব। যশোদা মাতা দুগ্ধকে রক্ষার নিমিত্তে কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এইটি কৃষ্ণকে ক্ষোভিত করেছিল। "আমার মা অন্য কর্মের নিমিত্ত কিরূপে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন? অন্য কিছু ব্যতীত তার শুধুই আমাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত?"

ক্রোধিত হয়ে তিনি একটি মাখন পূর্ণ পাত্র ভেঙে ফেলেন। মাতা যশোদা তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন এই ভেবে ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন। যশোদা তাঁর চপল সন্তানকে সংশোধন করতে মনস্থ করেছিলেন তাই তিনি একটি ছড়ি নিলেন। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের হাতের ছড়িটি দেখে ভীত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন। কৃষ্ণ সমস্ত ঘরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন এবং অনেক পরিশ্রমের পর মাতা যশোদা তাঁকে ধরতে সক্ষম হলেন। কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণের ভীত সন্ত্রস্ত সজল নয়ন দর্শন করলেন তখন তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তার হাতের ছড়িটি পরিত্যাগ করলেন এবং অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি দানে মনস্থ করে কৃষ্ণকে একটি কাষ্ঠের উদুখলে বন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটি রজ্জু নিলেন এবং তা দিয়ে কৃষ্ণকে বন্ধন করার প্রয়াস করলেন কিন্তু রজ্জুটি দুই আঙ্গুল ছোট পড়ে গেল। তিনি আরও অনেক রজ্জু সংযোজন করলেন তথাপি তা পুনরায় দুই আঙ্গুল ছোট পড়ে গেল। পরিশেষে তাঁর গৃহে যত রজ্জু ছিল সমস্তই তাতে সংযোজন করেও ঠিক সেই দুই আঙ্গুলই ছোট পড়ে গেলে তিনি কৃষ্ণকে বন্ধনের নিমিত্ত প্রাণপণ প্রয়াস করতে লাগলেন কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে বন্ধন করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় মাতার উদ্বিগ্ন এবং ক্লান্ত মুখ মণ্ডল দর্শন করলেন। তিনি তাঁর মাতার শুদ্ধ, নিষ্কাম, নির্মল, নিঃস্বার্থ ভক্তি দর্শন করলেন। তিনি মনস্থ করলেন যে মাতাকে আর অধিক বিব্রত করবেন না এবং তিনি তাঁর মাতার শুদ্ধ ভক্তি রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটিকে দামোদর বলা হয়, "যার উদর (পেট) রজ্জু (দাম) দ্বারা আবদ্ধ।"

এই লীলাটি ভক্তের অনন্য মহিমাকে আলোকিত করে। যোগী এবং মুনিগণ বহু বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যার ফলেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হতে সক্ষম হন না। জ্ঞানীগণ তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিমাপ করার প্রয়াস করেন কিন্তু তারা তাঁর মহিমা অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিঃসংশয়ে তাঁর ভক্তের হাতের পুতুল হয়ে যান, তিনি এইরূপে ভক্তের সঙ্গে প্রেমরস আস্বাদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, "ভগবান ভক্তের দ্বারা বশীভূত হন এবং ভক্ত ভগবানের দ্বারা বশীভূত হন। একে অপরকে এইরূপে সন্তুষ্ট করার ফলে ভক্ত এবং ভগবান উভয়েই চিন্ময় আনন্দরস আস্বাদন করেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৬।৩৪)।

এই অনুপম লীলাটি কার্তিক মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং এই মাসে ভক্তরা ভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে দামোদর অষ্টকম্ পাঠ করেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে ঘৃতদীপ নিবেদন করেন।

১৯৭৪ সালের ৬ই জুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড-হেলথ্ অর্গানাইজেশান) সম্মুখে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের একটি বক্তৃতার পরে নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়েছিল।

বিশ্ব খাদ্য সরবরাহ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

W.H.O সদস্য ঃ হে মহামান্য, বিশ্ব খাদ্যসঙ্কট সমাধান বিষয়ে আপনার কোন পরামর্শ আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। আমার পরামর্শ হলো যে, সমস্ত খালি জায়গাকে মানুষের শস্য ফলনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। আমি অনেক জমি খালি পড়ে থাকতে দেখেছি। উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রেলিয়ায় এবং আমেরিকাতেও অনেক জমি খালি রয়ে গেছে। মানুষ সেগুলি সদ্ব্যবহার করছে না। এমন কি, যে ফসল তারা পায়, মূল্যবৃদ্ধি রাখার উদ্দেশ্যে তার অনেকটাই কখনো কখনো তারা সমুদ্রে ফেলে দেয়। আমি শুনেছি জেনেভায় যখন তারা অতিরিক্ত দুগ্ধের উৎপাদন পেয়েছিল শুধুমাত্র দুগ্ধ উৎপাদন হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ কুড়ি হাজার গাভীকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

মানুষের মস্তিস্কে এই সবই চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন মস্তিস্কই নেই। যদি তারা কিছু মস্তিস্ক পেতে চায় তাদের এই সকল প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করা উচিত এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা উচিত এবং সেই নির্দেশনা খুব সরল, নিজের খাদ্য—সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনীয় খাদ্য জমির সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন কর। কিন্তু বর্তমানে মানুষ জমির সদ্ব্যবহার করবে না। বরং তারা তাদের গ্রাম এবং কৃষিজমি ত্যাগ করে নাট বোল্ট উৎপাদন করার জন্য শহরের

বলা হয়েছে, *তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*। যত বড় পরিকল্পনাই আমরা করি না কেন একদিন সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হবে। কারণ একদিন আমাদের এই দেহ ত্যাগ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে আমরা কি দেহ প্রাপ্ত হব তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

মনে করুন এইবার, এই জীবনে আমি এক বিশাল আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করতে খুব ব্যস্ত। আগামীবার, পরের জীবনে সেই আকাশছোঁয়া অট্টালিকায় একটি বেড়াল অথবা কুকুর রূপে আমি বাস করতে পারি কারণ আমার মধ্যে আমি বেড়াল বা কুকুরের স্থূল স্বার্থপর দেহাত্মবোধের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলাম। এবং সেই সময় কে সেই আকাশছোঁয়া অট্টালিকায় আমার তথাকথিত পদবীর যত্ন নেবে?

এই হলো ঘটনা। কারণ কেউ প্রকৃতির নিয়মকে

দিকে ধাবিত হবে। ঠিক আছে। এখন নাট বোল্ট খাও।

প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন মহাত্মা গান্ধীর মৌলিক পরিকল্পনা ছিল। ভগবান প্রদত্ত জীবনধারা—সকল গ্রাম এবং কৃষি। এটি ভারতের এবং সমগ্র জগতের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারত। কিন্তু আমাদের মহান পণ্ডিত নেহরু সবকিছু ওলটপালট করে দিলেন। তিনি অধিক শিল্পায়ন চাইলেন।

গান্ধীর পরিকল্পনা খুব সুন্দর ছিল—আপনি আপনাদের ক্ষুদ্র কৃষিগ্রাম একত্রিত করুন এবং নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করুন। শহর এবং কারখানা থেকে মুক্ত থাকুন। এইভাবে মাত্র তিন মাস কাজ করেও আপনি গোটা বছরের ফলন পাবেন।

সারা বছরের উৎপাদনের জন্য তিন মাসের কাজ। অতিরিক্ত যে সময় আপনি বাঁচালেন তা হরেকৃষ্ণ জপ কীর্তনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ভগবানের মহিমা কীর্তন করুন এবং আপনার মৌলিক ভগবৎচেতনার উন্মেষ করুন। এই হলো আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি করে প্রকৃত মানুষ হন।

অন্যথায় আপনি যে জীবন যাপন করছেন তা বিপজ্জনক। ভগবদগীতায়

> “সমস্ত প্রাণীরা অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করে, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে।”
>
> এই কারণেই আমরা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের এই আন্দোলনের সূচনা করেছি। এটি হলো সংকীর্তন যজ্ঞ। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দুর্ভাগ্যের যুগে এই যজ্ঞই একমাত্র সম্ভব। এই হলো নিরাময়, সমগ্র বিশ্বের সমস্যার সমাধান।

পরিবর্তিত করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম ঠিক একটি সংক্রামক রোগের মতো—এর সংস্পর্শে এলে এটি আপনাকে গ্রাস করবে, সেটাই সব। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ঃ* প্রকৃতির অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কারণে এবং নিজের পূর্বতন কর্মের জন্য একজনকে সুন্দর বা কুৎসিত পরিবেশে জন্ম নিতে হয়। এইটিই প্রকৃতির নিয়ম।

কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষ মৃত্যুর পর জীবন আছে তাতে বিশ্বাস করে না। মস্কোতে একজন বড় অধ্যাপক কটভস্কি আমায় বললেন, "স্বামীজি, মৃত্যুর পরে কিছু নেই!" আপনি দেখলেন, একজন বড় অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তার আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই।

একজন বড় অধ্যাপক—দেখুন। এই প্রকার অর্থহীনতা চলছে।

সুতরাং যেহেতু এই নাস্তিক সভ্যতা অনুসৃত হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে আরো অধিক সমস্যা হবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে অনাবৃষ্টি, অপ্রতুল বৃষ্টি হবে এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ, অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হবে। অবশ্য এই সমস্যাগুলি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং দুর্ভিক্ষ ও খরা হতে ত্রাণের অজুহাতে সরকার মানুষকে অত্যধিক করদানের জন্য জর্জরিত করবে। পরবর্তীতে *অচ্ছিন্ন ধারা দ্রব্য যস্যান্তি গিরি কাননম্*— মানুষ উত্যক্ত হয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যাবে। অপর্যাপ্ত বৃষ্টি, অপ্রতুল খাদ্য এবং সরকারের অধিক কর সংগ্রহের চাপে তারা অত্যন্ত উত্যক্ত বোধ করবে।

এই প্রকার ভবিষ্যৎবাণীতে কিভাবে একজন তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষা করবে? সে উন্মাদ হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা শাস্ত্রের বাণী গ্রহণ করব, আমাদের উপর এই সকল দুঃখ দুর্দশা সঙ্ঘটিত হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে ভগবদ্‌গীতার এই নির্দেশ ধারণ করতে হবে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।

"সমস্ত প্রাণীরা অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করে, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে।"

এই কারণেই আমরা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের এই আন্দোলনের সূচনা করেছি। এটি হলো সংকীর্তন যজ্ঞ। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দুর্ভাগ্যের যুগে এই যজ্ঞই একমাত্র সম্ভব। এই হলো নিরাময়, সমগ্র বিশ্বের সমস্যার সমাধান।

পরম সৌভাগ্যবতী মা যশোদা

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

দামোদর মাস কথাটির উৎপত্তি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের দামোদর নামটি থেকে। দাম মানে হচ্ছে দড়ি আর উদর মানে হচ্ছে পেট। তো ভগবানের নাম দামোদর কেন? কারণ তাঁর উদরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, তাই তিনি দামোদর। আজ থেকে পাঁচহাজার বৎসর আগে দীপাবলী অমাবস্যার দিনে পরমেশ্বর ভগবান ব্রজধামে তাঁর এই অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই লীলাটি হচ্ছে ভক্তের ভক্তির বন্ধনে ধরা পড়ার লীলা বা ভক্তের বশ্যতা স্বীকার্য লীলা। তাই শুকদেব গোস্বামী এই দাম বন্ধন লীলা বর্ণনা করে পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন—

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৯/১৯)

স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, কখনও পরাধীন নন। এই যে জড় জগৎ আমরা দেখছি, এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর বা পরম নিয়ন্তা এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র আদি দেবতাগণ যাঁর অধীনে কাজ করেন সেই ভগবান কৃষ্ণ যে কিভাবে *ভৃত্যবশ্যতা* অর্থাৎ ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন এই লীলার মাধ্যমে তিনি তা প্রদর্শন করেছেন। তিনি স্বয়ং পরম ব্রহ্ম হয়েও তাঁর ভক্তের জন্য এই প্রকার সুযোগ প্রদান করেছেন আর তাই মা যশোদা হচ্ছেন পরম সৌভাগ্যবতী। তাঁর সৌভাগ্যের গণনা করা যায় না। কেননা একমাত্র মা যশোদার সঙ্গেই তিনি এই দুর্লভ লীলা প্রদর্শন করেছেন। ভগবান সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও সেই আত্মারাম ভগবানের সম্পূর্ণ বিপরীত লীলা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আত্মারাম হলেও ভগবান কি করে ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন? পূর্ণকাম হয়েও তিনি কেন অতৃপ্তের ভাব প্রদর্শন করছেন? শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ হয়েও ভগবান কিভাবে ক্রোধান্বিত হচ্ছেন? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীপতি হয়েও কেন তিনি চুরি করছেন? যমাদির ভয়দাতা হয়েও তিনি মা যশোদার কাছ থেকে ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন এবং দ্রুতগতিতে চলার ক্ষমতা থাকলেও তিনি মা যশোদার হাতে কিভাবে ধরা পড়ছেন? পূর্ণ আনন্দময় হয়েও ভগবান কিভাবে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে মা যশোদার কাছে গিয়ে রোদন করছেন? সর্বব্যাপক হয়েও পরমেশ্বর ভগবান কি করে তাঁর ভক্ত মাতা যশোদার হাতে আবদ্ধ হচ্ছেন, আর মা যশোদাই বা কি করে একটি সাধারণ জড়জাগতিক দড়ি দিয়ে সেই

অসীম ভগবানকে বন্ধন করতে সক্ষম হচ্ছেন? শ্রীমদ্ভাগবতে তাই মাতা যশোদাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৯/২০)

প্রসাদম্ অর্থ হচ্ছে অনুগ্রহ আর *লেভিরে* অর্থ হচ্ছে লাভ করা। শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন, এই গোপী মা যশোদা ভগবানের যে অনির্বচনীয় প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন তেমন অনুগ্রহ আর কেউই লাভ করেননি। *ন ইমং বিরিঞ্চি* অর্থাৎ ব্রহ্মাও এই উচ্চ অনুগ্রহ লাভ করেন নি; *ন ভবো* শিবও এমন কৃপা লাভ করেননি; এবং *ন শ্রীঃ অপি অঙ্গ সংশ্রয়া* অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সদা সর্বদা ভগবানের অঙ্গে বা বক্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও এই ধরনের বিশেষ কৃপা, মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেননি। এখানে *বিমুক্তিদাৎ* কথাটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎ থেকে একমাত্র মুক্তি প্রদানকারী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মুক্তি দান করলেও এই ধরনের কৃপা বা সৌভাগ্য তিনি সকলকে দান করেন না যা তিনি মা যশোদাকে দামবন্ধন লীলা প্রদর্শনের মাধ্যমে দান করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে যাবেন, সেই সময় তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন। সেই সময় কুন্তীদেবী এই দামবন্ধন লীলার কথা স্মরণ করে বলছেন—"আমি এক সাধারণ নারী। আপনাকে আমি কিভাবে বুঝতে পারব। আপনি স্বয়ং ভগবান হয়েও মা যশোদার হাতে নিজেকে একটি দড়ির দ্বারা আবদ্ধ করে যে লীলা প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি সম্পূর্ণ বিমোহিত। আমার মতো এক সাধারণ নারী এই লীলার তাৎপর্য কি করে বুঝতে পারবে!"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন মাতা যশোদাকে এই প্রকার সৌভাগ্য প্রদান করেছিলেন? এ বিষয়ে বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৯/২১)

"স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে রকম সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী, আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসী যোগী অথবা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে তেমন সুলভ নন।"

একমাত্র যেভাবে ব্রজবাসীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, সেইভাবে ব্রজবাসীদের আনুগত্যে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে আমরাও ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।

মা যশোদা কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন? সে কথা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে। কার্তিক মাসের দীপাবলীর দিন গৃহের দাসীরা যখন নানাবিধ কর্মে ব্যস্ত ছিল, সে সময় মা যশোদা পুত্রের মঙ্গল কামনায় নারায়ণের সেবার জন্য বা নারায়ণের ভোগের জন্য বিশেষ দধিতে দধিমন্থন করতে লাগলেন। কেন স্বয়ং যশোদা

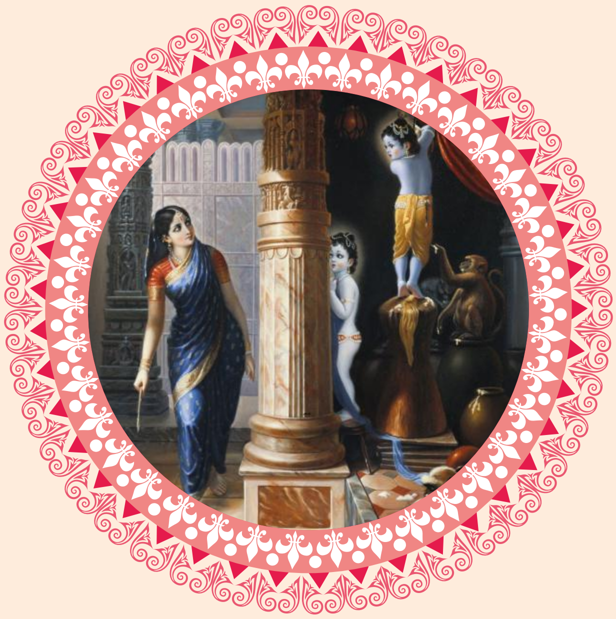

নিজ হস্তে এই দধি মন্থন করছিলেন? তিনি কি দাসীদের দিয়ে তা করাতে পারতেন না? না, যেহেতু আমার স্নেহের পুত্র কৃষ্ণ এটি উপভোগ করবে তাই কোন দাসীর হাতে তিনি এই দধি মন্থনের কাজটি দিতে চাননি, নিজের হাতে দধি মন্থন করেছেন। আর সব থেকে উপাদেয় মাখন কিভাবে তোলা যায় মা যশোদা সেটি সবচেয়ে ভালো জানেন। যে দধি দিয়ে তিনি মন্থন করছিলেন, সেটিও সাধারণ নয়। বিশেষ উচ্চগুণজাত কিছু গাভীর দুধের দধি তিনি মন্থন করছিলেন।

নন্দ মহারাজের নয় লক্ষ গাভীর মধ্যে সাত আটটি গাভী ছিল অত্যন্ত উচ্চগুণজাত বিশেষ ধরনের গাভী। যেমন ঃ 'পদ্মগন্ধিনী', 'ধবলী', ইত্যাদি। এরা অত্যন্ত সুস্বাদু সুগন্ধী ঘাস খেত। তাদের দুধও হতো তেমনই সুস্বাদু ও সুগন্ধী। সেই দুধের দধি দিয়ে মা যশোদা দধিমন্থন করছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই মন্থন করছিলেন কারণ তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন আমার ছেলেকে মুখরোচক মাখন খাওয়াতে হবে, ভালো মাখন ওঠাতে হবে ছেলের জন্য। কৃষ্ণের প্রতি এহেন বাৎসল্য প্রেমের বশবর্তী হয়ে মা যশোদা স্থির করলেন 'আজ থেকে এই বালক কৃষ্ণের খাদ্য নবনীত দুগ্ধাদি সবকিছু আমি নিজে করব। আমি এত সুন্দর করে মাখন তুলব যে আমার এই মুখরোচক মাখন খেলে কৃষ্ণ আর পরের বাড়িতে চুরি করতে যাবে না। আমার ছেলে সবার বাড়ি ঢুকে মাখন চুরি করছে।' কৃষ্ণের যাতে এই রকম চুরির রুচি না গড়ে ওঠে মা যশোদার মনে এমনই এক ভাব বা চিন্তা এসেছিল।

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণও মা যশোদার বাৎসল্যভাবে সাড়া দিলেন। দীপাবলীর সকালে মা যশোদা দধি মন্থন করছিলেন। মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার গান করতে করতে সুন্দর রেশমী বস্ত্র পরিধান করে তিনি দধি মন্থন করছিলেন। তার কঙ্কন ও কুণ্ডল দুলছিল, মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত, কেশপাশ থেকে মালতি ফুল ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও মা যশোদা দধি মন্থন করে চলেছেন। এমন সময় শিশু কৃষ্ণের ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই তাঁর খুব ক্ষুধা পেল। আত্মারাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সকাল সকাল ক্ষুধার্ত। তখন সাধুগণের মনোহরণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানের অভিলাষে মা যশোদার কাছে উপস্থিত হয়ে মায়ের নিকট দাবি করলেন যে তিনি যেন দধি মন্থন বন্ধ করে তাকে স্তন্য দান করেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ মা যশোদার মন্থন দণ্ডটি চেপে ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করছিলেন। মা যশোদা দেখছিলেন যে আমার ছেলে এখন কত শক্তিমান হয়েছে। সে এখন আমার স্তন্যপান করবে বলে আমার হাত চেপে ধরছে। কৃষ্ণের এই ভাব দেখে মা যশোদার মনে আনন্দ হলো।

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ যদিও কামনা শূন্য তবুও তিনি ভক্তের আনন্দ বিধানার্থে সকালবেলা স্তন্যপানের কামনাযুক্ত হয়ে মা যশোদার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন তার বাৎসল্য, প্রীতি, আনন্দকে বর্ধিত করার জন্য। ভগবান কৃষ্ণ যদিও হচ্ছেন নিষ্কাম, তার কামনা নেই তবু তিনি পরম সৌভাগ্যবতী মাতা যশোদার কাছে তার এই ক্ষুধা কাতরতার ভাব প্রকাশ করলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমের বিষয়, তিনি বিষয় বিগ্রহ এবং মা যশোদা আদি ভক্তগণ হচ্ছেন আশ্রয় বিগ্রহ। কার্তিক মাস হচ্ছে ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় মাস। এই মাসেই দীপাবলীর দিন তিনি পরম সৌভাগ্যবতী মা যশোদার কাছে তাঁর দামবন্ধন লীলা প্রকাশ করেছিলেন। এই মাসে তাই ভগবানের লীলার শ্রবণ, কীর্তন, বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। পুরাণসমূহে এই মাসের মাহাত্ম্য তাই নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনারা সকলে তাই এই কার্তিক মাসটিতে বিশেষভাবে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করুন, পাঠ করুন এবং কীর্তন করুন।

প্রশ্ন১। আপনারা সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ—এরকম চারটি যুগের কথা বলেন। কিন্তু আমরা তো আমাদের স্কুলের সিলেবাসে তিন যুগ—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কথা পড়াশুনা করেছি। এই ব্যাপারে কিছু বলুন। —**পটল জানা**, পশ্চিম মেদিনীপুর

উত্তর ঃ ৫ হাজার বছর হলো কলিযুগ শুরু হয়েছে। আজ থেকে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার বছর পরে আবার সত্যযুগ শুরু হবে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে দ্বাপর যুগ ছিল। আজ থেকে ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার বছর আগে ত্রেতাযুগ ছিল। আজ থেকে ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিল। ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে পৃথিবীতে বর্তমান কলিযুগ শুরু হয়েছিল। সেই দিনটি ছিল মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি শুক্রবার।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারিযুগকে এক মহাযুগ বলা হয়। যার মোট মেয়াদ হলো ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর। এই রকম ৭১ চতুর্যুগ আবর্তিত হলে ১ মন্বন্তর হয়। যার মেয়াদ ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বছর। বর্তমানে চলছে বৈবস্বত মন্বন্তর। এর আগে ছিল চাক্ষুষ মন্বন্তর। তার আগে ছিল রৈবত মন্বন্তর। তার আগে ছিল তামস মন্বন্তর। তার আগে ছিল ঔত্তম মন্বন্তর। তার আগে ছিল স্বারোচিষ মন্বন্তর। তারও আগে ছিল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর। মোট ১৪টি মন্বন্তর হলে তাকে বলে ১ কল্প। যার মেয়াদ হলো ৪৩২ কোটি বছর। এই রকম ৩০টা কল্প আছে। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। এই কল্পে সাত নম্বর মন্বন্তরের আটাশ নম্বর মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগের সাড়ে পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে আমরা এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। শ্রীমদ্ভাগবতে অতীত মন্বন্তরে পৃথিবীতে কারা রাজত্ব করছিলেন তাঁদের কথাও বলা হয়েছে।

কিন্তু তোমাদের স্কুলের সিলেবাসে যে প্রাচীন যুগের কথা বলছো, সেটা মাত্র আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগেকার কোনও কাহিনী। সেটি এই কলিযুগেরই কথা। তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী প্রাচীন যুগ বলতে একাদশ শতাব্দীর আগে বোঝায়। মধ্যযুগ বলতে একাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেকার সময় বোঝায়। ঐ সময়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি না হওয়াতে মানুষের জীবন যাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। তোমাদের সিলেবাসে সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়কে আধুনিক যুগ বলে। এখন মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়েছে, মোবাইলও তোমাদের মাথা খেয়ে ফেলছে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দী চলছে। ২০১৯—২০২১ খৃষ্টাব্দ এখন করোণা নামক জীবাণু এসে সমগ্র পৃথিবীর করুণ অবস্থা করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন২। ভক্তদের মধ্যে হিংসা অহংকার কেন? —**প্রেমানন্দ দাস**, লতিবারী, আসাম

উত্তর ঃ কলিযুগের বৈশিষ্ট্য থাকতেই পারে। জন্মগত, সংস্কারগত, বিচিত্র সঙ্গের প্রভাবগত প্রভৃতি দোষ থাকতেই পারে। অতীতের নানাবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতা, কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনার দরুণ নানাবিধ মানসিক চাপ আসতে পারে। সেইজন্য আচরণ কখনও কখনও অত্যন্ত রূঢ় হতে পারে। মানুষ খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তিসাধন পথে এসেছি। খারাপ মনোভাব ছেড়ে দিয়েছি। হয়তো কখনও কখনও খারাপ আভাস ফুটে ওঠে মাত্র। যেমন—কোনও বস্তু মাজাঘসা চলছে, তাতে ময়লা খুব উঠছে বলে দেখা যায়। কিন্তু সাফাই তো হচ্ছেই। ভক্তরা খারাপ নয় কেননা তারা খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করেছে। সেগুলি আর ধরবে না। বহু দিন করে বসেছে যেগুলি, সেই খারাপ আচরণ বন্ধ হলেও কখনও তাদের কথাবার্তার সেইরকম ভাব যেন রয়ে গেছে বলে মনে হয়, যেমন চলন্ত পাখার সুইচ অফ্ করে দিলেও কিছুক্ষণ পাখা ঘুরতে থাকে।

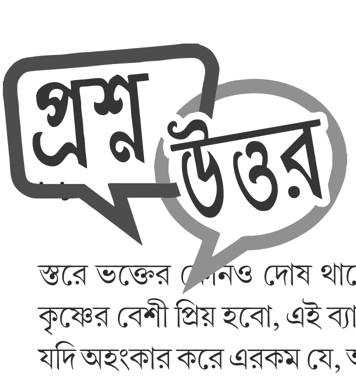

ভক্তি সারণীতে একাশি রকমের ভক্ত আছেন। তাঁদের সবার ভক্তিই মিশ্র ভক্তি। নববিধা ভক্তি × মায়ার ত্রিগুণ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ × ত্রি ভক্তি স্তর বা উত্তম, মধ্যম ও অধম = প্রকার মিশ্র ভক্তি। মিশ্র ভক্তের কোন না কোনও দোষ থাকবে। এই ৮১ প্রকার মিশ্র ভক্তির ঊর্ধ্বে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। যে ভক্তিকে বলা হয় অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি। সেই স্তরে ভক্তের কোনও দোষ থাকে না। যদি কেউ হিংসা করে এরকম যে, আমার কৃষ্ণকে আমিই বেশী ভালোবাসব, আমি কৃষ্ণের বেশী প্রিয় হবো, এই ব্যাপারে অন্য কেউ আমার মতো বাহাদুর নয়। তাহলে তাতে কারও সমস্যা নেই। আবার কেউ যদি অহংকার করে এরকম যে, আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ আমারই প্রভু। আমি প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণকে আমার হৃদয়ে বসিয়ে রাখব। তাতে কোনও সমস্যা নেই। এই ধরনের হিংসা অহংকার দিব্য।

প্রশ্ন৩। যেখানে সাত্ত্বিক ভাবের জায়গা সেখানে ঘোর তামসিক ভাব কেন আসবে?

এরপর ১২পাতায়.......

ভগবদ্‌গীতায় দেবোপাসনা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কি বক্তব্য ?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবোপাসনাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবতাদের মধ্যে তফাৎ সম্পর্কে অজ্ঞ তারা অন্যান্য দেবতাগণকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে পূজা করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা দেবতাপূজা করে।" সাধারণত যাদের প্রভূত জড় বাসনা থাকে তারা দেবতাদের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং তাদের পূজা করেন। দেবোপাসকগণ মনে করেন একটি বিশেষ দেবতার উপাসনা করলে দ্রুত ফল লাভ করা যায়।

দেবতা কারা ?

দেবতারা হলেন জীব তত্ত্ব, জীবাত্মা, আপনার এবং আমার ন্যায়। তারাও এই জড় জগতে নিবাস করেন। দেবতারা আপনার এবং আমার অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী কিন্তু তারা কৃষ্ণ বা তাঁর অংশ প্রকাশের সমতুল্য শক্তি সম্পন্ন নন। দেবতাগণ উচ্চলোক যথা সূর্যলোক, চন্দ্রলোক এবং অন্যান্য স্বর্গলোকে নিবাস করেন। তাদের বিশেষ পুণ্যকর্মের কারণে এই জড়জগত পরিচালনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে এই বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

তাঁরা হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তাঁরা তাঁদের শক্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবতাদের মধ্যে সম্পর্কটি অনুধাবন করতে হবে।

ঠিক রাজার যেমন রাজ্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী থাকেন অনুরূপভাবে দেবতাগণ এই জড়জগত পরিচালনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করেন। রাজ্যের মন্ত্রীগণ রাজার নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। তাঁরা কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে কাজ করেন। মন্ত্রীগণ যেমন রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রী সভায় থাকেন, অনুরূপভাবে দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে তাদের পদে স্থিত থাকেন।

ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি হলেন দেবতা। এমনকি মহাদেব এবং ব্রহ্মাদেবও হলেন দেবতা। কিন্তু মহাদেবের একটি অনন্য অবস্থান রয়েছে।

দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের গুরুত্ব ঃ

ভগবদ্‌গীতায় তৃতীয় অধ্যায় দশম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে এই জড় জগতে সুখে শান্তিতে বাস করতে হলে এবং পরিশেষে মুক্তি লাভ করতে হলে দেবতাদের সন্তুষ্ট করা এবং সহায়তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবতারা যজ্ঞে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁরা যখন সন্তুষ্ট হন তখন

তাঁরা এই জড়জগতে সুখে বাস করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন।(গীতা ৩।১১)

যজ্ঞে প্রকৃতপক্ষে কে পূজিত হন?

সুতরাং যখন কেউ দেবতাদের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করে সে তখন অপ্রত্যক্ষ ভাবে ভগবান বিষ্ণু বা ভগবান কৃষ্ণেরই পূজা করে। ভগবান বিষ্ণু হলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন যজ্ঞপতি। যজ্ঞকুণ্ড হলো ভগবান বিষ্ণুর মুখ এবং যজ্ঞাগ্নি হলো ভগবান বিষ্ণুর জিহ্বা। সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা হলেন ভগবান বিষ্ণু।

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, ‘‘ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তা হলেও সমস্ত যজ্ঞের যজ্ঞপতি এবং পরম ভোক্তারূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ভগবদ্‌গীতাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা-*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্।*’’(গীতা ৩।১১)

তাৎপর্য ঃ

ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায় বাইশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে দেবতাদের আরাধনা লব্ধ ফল প্রকৃত পক্ষে তিনিই প্রদান করেন।

সুতরাং যদি আমরা সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি তাহলে আর আলাদাভাবে অন্য দেবতাদের আরাধনা করার প্রয়োজন পড়ে না।

এই কলিযুগে সর্বোত্তম যজ্ঞটি হলো সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ। এটি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন তখন দেবতারাও খুশী হন।

তাই কৃষ্ণভক্তদের আলাদা করে দেবোপাসনা করার দরকার নেই। আমরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন লীলাতে দেখতে পাই যে তিনি ইন্দ্রপূজার অনুমোদন দেননি। সেই লীলাতে আমরা এও দেখতে পাই যে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব স্বয়ং তার ভুলের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

দেবতাদের আরাধনা লব্ধ ফল কেন সীমিত এবং অস্থায়ী?

যারা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জানে না যে দেবতারা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারা জড় আশীর্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেবতাদের আরাধনা করে যেহেতু দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান নন তাই তাদের আরাধনা লব্ধ ফলটি সীমিত এবং অস্থায়ী।

দেবোপাসকগণ তাদের মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করেন। তাদের পুণ্যফল পূর্ণরূপে ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তারা দেবলোকেই বাস করেন। যখনই তাদের পুণ্যফল সমাপ্ত হয় তখন তাদের দেবলোক পরিত্যাগ করে পুনরায় মর্ত্য লোকে ফিরে আসতে হয়। আর আমাদের এটিও বুঝতে হবে যে দেবলোকও অস্থায়ী। যারা দেবলোকে বাস করেন তাদেরকেও এই জড়জগতের জন্ম মৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু যখন কেউ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয় তখন সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম প্রাপ্ত হয় যা হলো স্থায়ী এবং সেখান থেকে আর কোনও দিন জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

কৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনা লব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু

আমার ভক্তেরা আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন। (গীতা ৭।১৩)

যখন কোন ব্যক্তি একবার কৃষ্ণলোকে গমন করেন তাকে আর জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। কৃষ্ণধামে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নেই। সেখানে কোন দুঃখ দুর্দশাও নেই। প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শাশ্বত আনন্দে বাস করেন।

যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি তার ফল অসীম এবং স্থায়ী

তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে দেবতাদের আরাধনা করার পরিবর্তে সকলের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে দেবতারাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

কেন কৃষ্ণ ভক্তদের আলাদাভাবে দেবোপাসনার প্রয়োজন নেই?

শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩১।১৪তে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমরা যদি বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করি তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তা কাণ্ড, পত্র, পুষ্প সকলেরই পুষ্টি সাধন করে এবং আমরা যদি উদরে খাদ্য দিই তখন তা সমগ্র দেহের পুষ্টি সাধন করে। অনুরূপভাবে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং আরাধনা করি তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত দেবতাগণ এবং জীবাত্মা সকল সন্তুষ্ট হবেন। কারণ দেবতাগণ এবং জীবাত্মা সকল হলেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুহ।

তাই কৃষ্ণভক্তদের আলাদা করে দেবোপাসনা করার দরকার নেই। আমরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন লীলাতে দেখতে পাই যে তিনি ইন্দ্রপূজার অনুমোদন দেননি। সেই লীলাতে আমরা এও দেখতে পাই যে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব স্বয়ং তার ভুলের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি তাঁর অধস্তন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পদটি দান করেছেন তাই তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি নিবেদন করছেন যে আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আপনি আমায় কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা স্বরূপ আপনার কাছে আমি এখন আশ্রয়ের জন্য এসেছি।" (ভাগতম্ ১০।২৭।১৩)

তাই কৃষ্ণভক্তরা দেবতাদের শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু আরাধনা করেন শ্রীকৃষ্ণের, যিনি হলেন পরমেশ্বর ভগবান। এই পন্থাটি প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

৯এর পাতার পর........

উত্তর ঃ ভাগবত পাঠের আসরে শ্রবণ করতে বসেও যেমন প্রচুর ঘুম পায় তেমনই। শরীরে ব্যাধি থাকলে ঘুম আসতেই পারে। মনে ব্যাধি থাকলে যেমন চোরের মন পুঁই আদাড়ে। ভাগবত সে শ্রবণ করতে বসে পুঁই ঝাড় হাতাবার চিন্তা করছে। মন্দিরে বহু সাধুসন্ত পুণ্যার্থী অতিথিগণের ভীড়। তারমধ্যে পকেটমারও ভীড় করতেই পারে। এভাবে ত্রিগুণময়ী মায়ার জগতে সবার ভাব বোঝা যায় না। কিন্তু যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

রাজস্থানী আটার লাড্ডু

উপকরণ ঃ আটা ৫০০ গ্রাম। চিনি ৩০০ গ্রাম। খাঁটি ঘি ১ বাটি। নারকেল কোরা ১ বাটি। অল্প চিরঞ্জি, চীনাবাদাম, কাজু ও পেস্তা কুচি করা ১ বাটি।

বঙ্গে যেমন তিলের ব্যবহার করা হয়, পশ্চিম ভারতে সেরকম চিরঞ্জি ব্যবহার করা হয়। খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু করবার জন্য পেস্তার মতো চিরঞ্জির ব্যবহার।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ উনানে কম আঁচে আটা শুকনো করে ভাজতে হবে প্রথমে। আটা লাল হয়ে এলে নামিয়ে একটি থালায় রাখুন। চিনি গুঁড়ো করে আটার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এবার কড়াইতে ঘি গরম করে চিনি মেশানো আটার মধ্যে সেই ঘি ঢেলে দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। একটু মেখে বাকি উপকরণগুলি অর্থাৎ নারকেল কোরা, চিরঞ্জি, বাদাম, পেস্তা ও কাজু ওই ঘি চিনি মেশানো আটার মধ্যে ঢেলে দিয়ে ভালো করে মাখুন।

গরম থাকতে থাকতেই পাক করে লাড্ডু বানিয়ে নিন। তারপর ঐ লাড্ডু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করুন।

রাজস্থানী কাঞ্জী বড়া

উপকরণ ঃ মুগডাল ৫০০ গ্রাম। আদা ১ ইঞ্চি মতো টুকুরো। কাঁচালংকা ৫টি। গোটা ধনে ১ চা-চামচ। জল ১ লিটার। হিং ১ চিম্‌টি। লবণ আন্দাজ মতো। হলুদ অল্প। সরিষা ৩ চা-চামচ, লবণ, হলুদ ও গুঁড়োলংকা একসাথে বাটা।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ডাল আগের দিন সারারাত ভিজিয়ে ধুয়ে আদা ও কাঁচা লংকা দিয়ে ভালো করে বেটে নিন। এবার ঐ বাটা ডালের মধ্যে লবণ, হলুদ, ধনে ও হিং মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন।

তেল গরম করুন। তেল গরম হলে ঐ মিশ্রিত বাটা ডাল থেকে একটু একটু নিয়ে বড়া ভেজে ফেলুন। ভাজা বড়াগুলিকে আধা ঘন্টা লবণ মেশানো জলে ভিজিয়ে তুলে নিন।

আস্তে করে সাবধানে জল চিপে বড়াগুলি থালাতে রাখুন। এবার জল ফুটিয়ে সেটি গরম থাকতেই তার মধ্যে সরিষা-লবণ-হলুদ বাটা মিশিয়ে দিন। এবার এই জলে বড়াগুলিকে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। এবার এই সুস্বাদু কাঞ্জীবড়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করুন।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের নবম প্রশ্ন

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

অর্জুনের নবম প্রশ্ন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়ের ১৭নং শ্লোক—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষুকেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।।

হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিন্তা করব?

এখন প্রশ্ন হতে পারে অর্জুনের মনে এই রকম প্রশ্নের উদয় হলো কেন? তার সহজ সরল উত্তর পেতে গেলে আমাদের আগের বিষয় বস্তু নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।
(গীঃ ৯।৩৪)

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এই ভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে। অর্জুনের মনে এই ভাবনার উদয় হচ্ছে 'প্রভু' শুধুমাত্র 'আমার' কথাটি কেন বার বার উল্লেখ করছেন,—শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, চন্দ্রের কথা কেন বলছেন না—উনাদের তো অনেক ভক্ত আছে। ভগবান অন্তর্যামী তাই অর্জুনের হৃদয়ে অবস্থান করে অর্জুনের মনের সব কিছু চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারলেন। তাই ভগবান চিন্তা করলেন

> ভগবান ভক্তকে আরও বিশেষ কৃপা করেন—ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে হৃদয়ের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করেন এবং উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন।
>
> অর্জুন যখন ভক্তের প্রতি ভগবানের এইরূপ কৃপা শ্রবণ করলেন—তখন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ বলে স্বীকার করলেন।

পারবে না—তাই ৭।৩ গীঃ দেখতে পাই ভগবান নিজেই বলেছেন, 'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' হাজার হাজার মানুষদের মধ্যে কোন একজন তাকে জানতে পারবেন। তাহলে আবার হৃদয়ে সন্দেহ থেকে গেল---আমার পক্ষে কিভাবে ভগবানকে জানা সম্ভব। যেমন ড্রেনের জলকে পরিস্কার করতে অনেক কষ্ট কিন্তু ড্রেনের জল যখন গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশে যায় তখন আর পরিস্কার হতে দেরী হয় না। আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনই কোন ব্যাক্তি যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয় তাহলেই সমস্ত সদ্ গুণাবলী তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ হয় এবং খুব সহজে ভগবানকে জানতে পারেন।

ভগবান বলতে চাইছেন — আমি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি, তারপর ব্রহ্মার মন থেকে চতুষ্কুমার, সপ্তর্ষি এবং চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়—এই পঁচিশ জন মহর্ষিরা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমুহের পিতৃকুল, যারা আমার বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন। তাই তারা অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান আরও বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য অর্জুন এর আগে আমার অনেক বিভূতির কথা জানতে পেরেছে তবুও আরো বিভূতির কথা জানতে ইচ্ছা করছে—যাতে পরবর্তীকালে কেউ কোন মানুষকে ভগবান বলে মনে করলে তাকে বিভিন্ন রকম বিভূতি দেখাতে হবে।

ভগবান সুন্দরভাবে অর্জুনকে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বললেন, হে অর্জুন, দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারে না—কারণ সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে — দেবতারা ও মহর্ষিগণ যদি ভগবানকে জানতে না পারেন — তাহলে আমাদের পক্ষে ভগবানকে বোঝা বা জানা কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর হচ্ছে — ছেলে কিভাবে বাবার জন্মের কথা জানতে পারবে—যদি বাবা কৃপা করে তাঁর জন্মের কথা জানায় তবেই জানতে পারবেন। ঠিক সেই রকম যাঁরা সর্বোতভাবে ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়েছেন তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবেন। ভগবান প্রকৃত পক্ষে বোঝাতে চাইছেন সকলে আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানতে

তিনি আরো বললেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতা।।

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন। আর যাঁরা ভজনা করেন তাঁদের লক্ষণ কিভাবে জানা যাবে তার উত্তর দিলেন ১০।৯ গীঃ শ্লোকে। শ্রীকৃষ্ণই তাঁর জীবন-ধন এবং তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্তন ও পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। তার ফলে ভক্ত কি লাভ করে থাকেন? ভগবান তাঁকে বুদ্ধিযোগ দান করেন, ফলে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। বুদ্ধি ভগবান সকল জীবকে দেন, যেমন—চোরকে চুরি করার বুদ্ধি ভগবানই দেন। একটা ইঁদুর সে জলের পাইপ ধরে কিভাবে উপরে উঠে এসে খাবার খাবে তারও বুদ্ধি ভগবান দেন। কিন্তু বুদ্ধিযোগ শুধুমাত্র ভক্তকে দেন যার ফলে ভক্ত ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন।

ভগবান ভক্তকে আরও বিশেষ কৃপা করেন—ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে হৃদয়ের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করেন এবং উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন।

অর্জুন যখন ভক্তের প্রতি ভগবানের এইরূপ কৃপা শ্রবণ করলেন—তখন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ বলে স্বীকার করলেন। অর্জুনের এই উপলব্ধি কিভাবে হলো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। তার উত্তর হচ্ছে ভগবানের অশেষ কৃপার ফলেই এই উপলব্ধি। অর্জুন আরো উপলব্ধিমূলক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে ভগবানকে সম্বোধন করেছেন, 'হে পুরুষোত্তম'—যিনি ক্ষর এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম। নির্বিশেষবাদীরা অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করলেও পরম পুরুষোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। 'হে ভূতভাবন' শ্রীকৃষ্ণকে সকল জীবের পিতা এটা অনেকে নাও জানতে পারেন তাই 'ভূতভাবন' বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ সকল জীবের পিতা রূপে জানলেও সকল জীবের পরমনিয়ন্তা রূপে নাও জানতে পারেন। 'হে দেবদেব'—সমস্ত দেব-দেবীর উৎস এবং আরাধ্য দেবতা 'হে জগৎপতে'—সমস্ত জগতের পতি বা অধীশ্বর। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছ হতে বিভিন্ন গ্রহলোকে তাঁর বিভূতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত রয়েছেন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন। যাতে বেশি করে শ্রবণ করা যায়, বেশি স্মরণ করা যায়। এই জন্যই অর্জুনের প্রশ্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—১০।১৭নং শ্লোকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নে এতটাই প্রীত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর উত্তর এই ভাবে শুরু করেছেন ''হন্ত তে'' হ্যাঁ তোমাকে—আমি আমার বিভূতি সম্পর্কে বলব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বিভূতির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন—২০নং থেকে ৩৯নং শ্লোকে ৭৪টি বিভূতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই জগতে (৪০নং শ্লোক) বা অপ্রাকৃত জগতে যা কিছু সুন্দর বা মহিমান্বিত তা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ ৯ম পর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

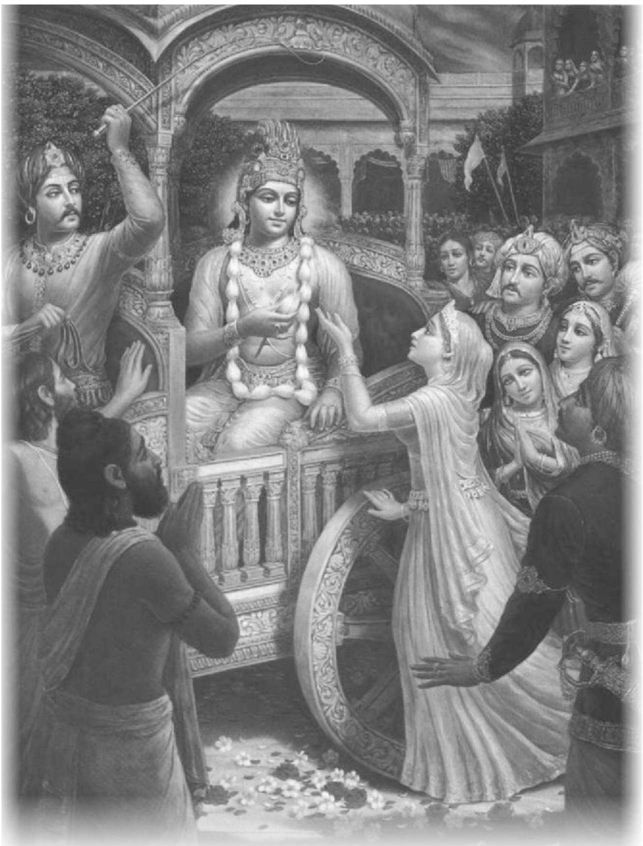

অধ্যায়ের সারাংশ ঃ

শ্লোকঃ ১–১৬

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের পারলৌকিক ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা সমাপ্ত করার ঠিক পরেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা অভিমুখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ উত্তরা গভীর ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্তী হলেন। তাঁর গর্ভস্থিত শিশুটিকে হত্যা করার জন্য অশ্বত্থামা মারাত্মক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। কৃষ্ণ পরমাত্মারূপে তাঁর গর্ভকে আবৃত করেন এবং উত্তরাকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ঃ ১৭--৪৩

শ্রীমতি কুন্তীদেবী তাঁর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করার পর কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরম স্থিতিকে উপলব্ধি করার বিষয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করলেন। কুন্তীদেবী পুনরায় বললেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন বিপদ থেকে তাঁর পুত্রদের সহ তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করলেন, একমাত্র যার কোন জড় জাগতিক আশ্রয় নেই তিনিই সহজেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যেতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় জন্ম কর্মের কথা বর্ণনা করার পর কুন্তীদেবী তাঁর আবির্ভাবের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করলেন। তিনি হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণকে থাকতে অনুরোধ করলেন। কারণ পাণ্ডবদের রাজ্যের মঙ্গল ও ঐশ্বর্যের শ্রীবৃদ্ধি তাঁর উপস্থিতির ফলেই সম্ভব। পরিশেষে, কুন্তীদেবী প্রার্থনা করলেন, যে, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তাঁর যে গভীর স্নেহের বন্ধন রয়েছে তা যেন ছেদন হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি যেন আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর একমাত্র আশ্রয়।

শ্লোক ঃ ৪৪--৫২

কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনা সমাপ্ত করলে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হস্তিনাপুর ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, যিনি প্রজাদের হত্যার জন্য গভীরভাবে হতাশাছন্ন হয়েছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এলেন এবং গভীর আলাপ করতে লাগলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একই পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এবং তাই তার ফলে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মীয়। ভগবান তাঁদের সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের প্রভাবে পীড়িত কুরুবংশের সদস্যরা মৃত্যুজনিত সমস্যার কারণে শোক করছিলেন, এবং ভগবান তখন জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাদের প্রতি পূজন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ

যদিও সমাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে সম্মান লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি কখনো সমাজের চতুরাশ্রম প্রথা লঙ্ঘন করেননি। ভগবান এই সমস্ত সামাজিক প্রথা পালন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে।

যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহন করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন। উত্তরা বললেন, হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী, আমাকে রক্ষা করুন, কারণ দ্বন্দ্ব ভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। শরণাগত জীবদের জন্য ভগবানই একমাত্র অভয়প্রদ আশ্রয়। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত এই জড় জগতে কেউই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

শ্রীমতি কুন্তীদেবী ভাল করেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করছেন, পরমহংসদের মুনিদের কাছে ভক্তিযোগ বিতরণ বিকশিত করতে আপনি অবতীর্ণ হন। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোক কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে।

উত্তরা বললেন, একটি জ্বলন্ত লৌহবান আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়েছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না

করে। তাঁর কথা শ্রবণ করে ভক্তবৎসল ভগবান, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল তথাপি নিজের প্রতিভা অনুসারে তাঁর অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন সেই সঙ্কট তাঁর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভগবান ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং তাই তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করার জাগতিক নীতিবোধের থেকে তাঁর ভক্তবাৎসল্যকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। এই ভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।

শ্রীমতি কুন্তীদেবী ভাল করেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করছেন, পরমহংসদের মুনিদের কাছে ভক্তিযোগ বিতরণ বিকশিত করতে আপনি অবতীর্ণ হন। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোক কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে। কুন্তীদেবী অন্য সমস্ত অবতারদের থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারদের বিশেষ বন্দনা করছেন, কেননা এই অবতারে তিনি সহজলভ্য।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন শুরু করতে হয় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর জানু, কটিদেশ, বক্ষদেশ এবং মুখমণ্ডল দর্শন করতে হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীমতি কুন্তীদেবী, ভগবানের পিসীমা হওয়ার ফলে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে তাঁকে দর্শন করতে শুরু করেননি, কেননা তাহলে ভগবান হয়তো লজ্জা অনুভব

করতেন। কৃষ্ণ কুন্তীদেবীর প্রতি অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। কেননা যদিও তিনি দেবকীর অন্যান্য পুত্রদের রক্ষা করেননি, কিন্তু কুন্তীর পুত্রদের তিনি রক্ষা করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন কেননা দেবকীর পতি বসুদেব জীবিত ছিলেন, কিন্তু কুন্তীদেবী ছিলেন বিধবা এবং কৃষ্ণ ছাড়া তাঁকে সাহায্য করার আর কেউ ছিল না। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যারা অধিক বিপদগ্রস্ত, কৃষ্ণ তাদের অধিক অনুগ্রহ করেন। স্বয়ং ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তথাপি তিনি মায়ের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে একটি সাধারণ শিশুর মতো দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। তাই মা যশোদার পদ কুন্তীদেবীর থেকে উর্ধ্বে। কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে পাণ্ডবদের অস্তিত্ব ছিল কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। নিঃসন্দেহে পাণ্ডবেরা তাঁদের নাম এবং যশে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মূর্তিমান ধর্মরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের পরিচালিত করছিলেন এবং যদুগণ ছিলেন তাঁদের মহান মিত্রপক্ষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধান ছাড়া তাদের কারুরই কোন অস্তিত্ব নেই। কুন্তীদেবী বললেন, হে গদাধর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণ যুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না। কুন্তীদেবী এই বিশেষ লক্ষণগুলির উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে হয়ত দুর্ভাগ্য দেখা দেবে। তিনি আরও প্রার্থনা করছেন, হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। কুন্তীদেবী অভিলাষ করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাহলে তার পিতৃকুল শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত। এই ধরনের পক্ষপাত কুন্তীদেবীর মনকে বিচলিত করেছিল এবং তাই তিনি স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার বাসনা করেছিলেন।

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালা দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর। শ্রীমতী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গমনোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন।

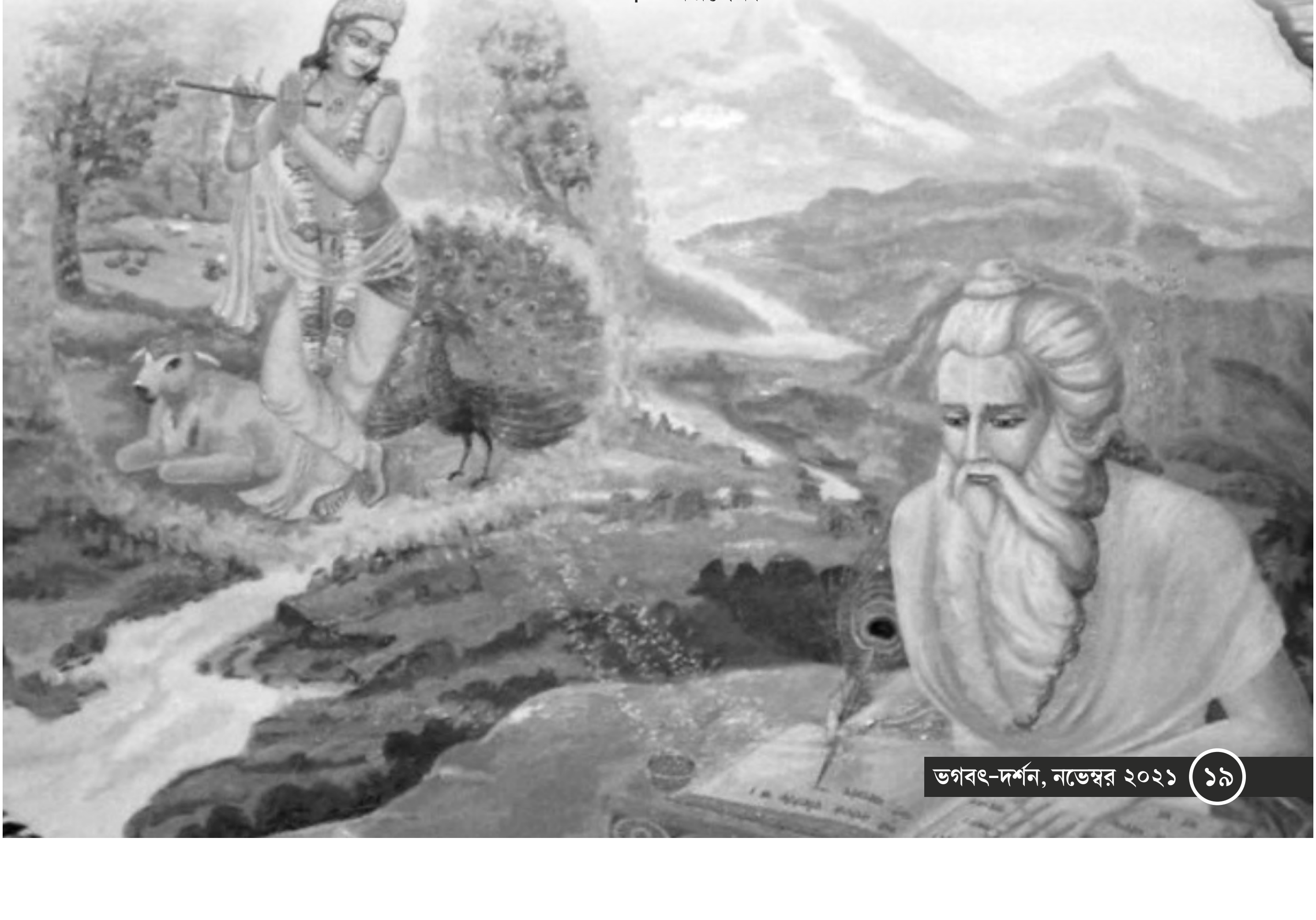

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

শ্রীধাম মায়াপুরে রাধাষ্টমী মহামহোৎসব

প্রাণনাথ গোবিন্দ দাস ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর প্রধান পারমার্থিক কার্যালয় শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, মঙ্গলবার শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত মহোৎসব যথেষ্ট আনন্দ উদ্দীপনা, ভক্তির অনুকুল বাতাবরণে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব, অতিমারি কোভিড-১৯ এর সংকটজনক পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি নিষেধ পালনে উদযাপিত হল।

উৎসবের সূচনা হয় ১৩ সেপ্টেম্বর অধিবাসের মধ্যে দিয়ে, সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে। অধিবাস অনুষ্ঠান সমাপনান্তে লুচি, আলুর দম, মুড়কি প্রসাদে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

রাধাষ্টমীর দিন ভোর ৪.৩০ মিঃ মঙ্গলারতি তারপর নিয়মিত অনুষ্ঠানের পর ৬.৩০ মিঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, রাধারানীর কথা রাধাতত্ত্ব আলোচনা প্রবচন হয়। ৮টায় দর্শন আরতি হয়। তারপর রাধারানীর উদ্দেশ্যে উপহার সামগ্রী প্রদান, ভজন, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর ১১টায় শুরু হয় অভিষেক অনুষ্ঠান। দুধ প্রভৃতি পঞ্চগব্য, মধু প্রভৃতি পঞ্চামৃত, গঙ্গাজল, ডাবের জল ইত্যাদি তরল পবিত্র দ্রব্য দিয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন হয়। কীর্তন, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অভিষেক কার্য হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় কীর্তনের আনন্দে ভক্ত জনগণ পারমার্থিক আনন্দের উত্তেজনায় আপ্লুত ছিলেন।

তারপর শ্রীবিগ্রহণের পূজা, ভোগরাগাদি নিবেদন এবং আরতিকাদি সমাপনান্তে সকল শ্রেণীর ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। দুপুর ১.৩০ মিঃ গদা ভবন, গীতা ভবন, নামহট্টে, সুলভ ভোজনালয়ে, অন্নদান প্রকল্পে মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন সন্ধ্যারতির পর প্রদীপ দান, হরিনাম কীর্তন হয়। সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভজন, কীর্তন, নৃত্য পরিবেশিত হয়। মন্দির অভ্যন্তরে শোভাবর্ধনের জন্য আলোক মালায়, পুষ্পে, পত্র পল্লবে সজ্জিত করা হয়। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির চত্বর, পার্ক, গাছ, জলের ফোয়ারা, বিভিন্ন অতিথি ভবনে রঙ-বেরঙের আলোক মালায় ও পতাকায় সজ্জিত করা হয়।

প্রতিবারের মতো এবারেও বিশেষ আকর্ষণ ছিল নতুন বস্ত্র ও অঙ্গরাগে শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, প্রভুপাদের নব সজ্জা পরিগ্রহ। এবারে অষ্টসখীসহ রাধামাধবের বস্ত্রের উপর কারুকার্য গঠিত চিত্রায়িত রূপায়ন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাত্রিতে শয়ন আরতির পর 'শ্রীরাধে' লেখা বিশালায়তন কেক উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

শ্রীরাধাষ্টমীর দিনটি ছিল মেঘলা, কখনও আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর। কাতারে কাতারে ভক্তগণ, জনগণ এই শুভ দিনে শ্রীমতী রাধারানীকে দর্শন করেন। শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী মহারাজের ৫১তম সন্ন্যাস বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো মায়াপুর হরেকৃষ্ণ নামহট্ট ভবনে। শ্রীল প্রভুপাদের কাছে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ২১ বছর বয়সে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু, শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষম স্বামী এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান মহারাজের মহিমা প্রবচন প্রদান করেন। জগৎ জীবের উদ্ধার বিষয়ে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী Zoom এর মাধ্যমে প্রবচন প্রদান করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে একটি বিশেষ স্মরণিকা মুদ্রা প্রকাশ করলেন

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে একটি ১২৫ টাকার স্মরণিকা মুদ্রা প্রকাশ করলেন।

বিশ্বব্যাপী ছয়শত ইসকন মন্দির এবং অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী ভগবদ্‌গীতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, ‘আমরা কেমন গর্ব এবং একাত্মতাবোধ অনুভব করি যখন আমরা বিদেশে ‘হরে কৃষ্ণ’ সহযোগে অভিবাদিত হই। তাহলে কল্পনা করুন যখন আমরা বিদেশে ‘‘মেড-ইন-ইণ্ডিয়া’’ পণ্য বস্তু অনুরূপভাবে সমাদর দেখতে পাব তখন আমাদের কত গর্ব বোধ হবে।’’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের জীবন কথা স্মরণ করেন যিনি বহু প্রতিকুলতাকে জয় করে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বব্যাপী ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা আজ প্রায় ৮০০-রও বেশী অনুরূপ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে তিনি তার প্রধান দপ্তর মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র দেশে ৩০০টি কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আজ সমগ্র বিশ্বে শত শত ইসকন মন্দির বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে যা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উদ্দম, উন্নত চিন্তা এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।’’

আলিপুর টাঁকশালে প্রস্তুতকৃত ১২৫ টাকার স্মরণিকা মুদ্রা প্রকাশের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই শুধু নয়, ইসকনকে তাদের সমগ্র দেশব্যাপী পৃথিবীর বৃহত্তম নিরামিষ খাদ্য ত্রাণ প্রকল্পের মতো সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, বিশেষত কোভিড অতিমারীর সময় যখন ইসকন স্বেচ্ছাসেবকরা সমগ্র দেশে ২৫ কোটি ভোজন সরবরাহ করেছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী জি. কিশান রেড্ডি এবং ইসকন ব্যুরো চেয়ারম্যান শ্রীমদ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যা এই বর্ষব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানটিকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণময় জীবন এবং উত্তরাধিকার মননে স্মরণীয় করে তোলে।

দুর্গাপুর ইসকনে ঝুলন যাত্রা মহোৎসব

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন, আর ইসকন মন্দিরে বোধ হয় বারো মাসে একশ পার্বন উৎসব মেলা লেগেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ‘আনন্দকন্দ’ তাই উৎসব আর উৎসব দিয়ে তিনি তার ভক্তদের পোষণ ও আনন্দবিধান করেন। বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠীতে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রার পরেই শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা। বৈষ্ণব আচার্য কবি কর্ণপুর তার ‘‘আনন্দবৃন্দাবন চম্পু’’ নামক গ্রন্থে ঝুলন যাত্রার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের প্রীতিবিধানে প্রতি বছর শ্রাবণ শুক্লা একাদশী (পবিত্ররোপন একাদশী) থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্রজবালাগণ সবুজে ঘেরা কুঞ্জকাননে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকে নিয়ে এই ঝুলন উৎসবে মেতে ওঠেন। তার লীলা আজও ভক্তদের হৃদয় কুঞ্জে উৎযাপিত হয়ে চলেছে।

ইসকনের বিভিন্ন মন্দিরে এই পাঁচদিন ঝুলন উৎসব বেশ

সমারোহেই উৎযাপিত হয়। এই বছর ইসকন দুর্গাপুর শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন মন্দিরও সেদিক দিয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

ইসকন দুর্গাপুরের গৃহস্থ ভক্তদের বিপুল উৎসাহ ও পূজারী বংশীমোহন প্রভুর সাহচর্যে ঝুলনের আগেই নতুন দোলনা বানানো ও কুঞ্জ সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর ১৮ই আগষ্ট দিনের বেলা থেকেই ভক্তদের আনাগোনা ও ঝুলন উৎসবের সাজো সাজো রব পড়ে যায়। বৈকালে শ্রীশ্রী রাধামদনমোহন অতীব সুন্দর শৃঙ্গার সুসম্পন্ন হয়ে পালকীযোগে প্রাণপ্রিয় প্রভু, কিশোর প্রভু, প্রদীপ প্রভু, এবং দিব্যধাম প্রভুর স্কন্ধে আরোহন করে ঝুলন মঞ্চে এসে বিরাজিত হন। ভক্তদের সুমধুর কীর্তনে এবং মন্দিরের যুব সম্প্রদায়ের ভক্তদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে ধূনোর গন্ধে ও ঠাসা ভক্তদের ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গন এক বৈকুণ্ঠময় পরিবেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রথমে, ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ ও পূজা নিবেদন হল এবং তারপর শ্রীমদ ভক্তিপুরুষোত্তম মহারাজ প্রথম ঝুলনের রশি আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রেমময় দোল দিতে লাগলেন। মহারাজ দীপের আরতি প্রদর্শন করলেন এবং বিদগ্ধ আলোচনার দ্বারা ভক্তদের মধ্যে সেই ভৌমবৃন্দাবনের ভাবকে প্রস্ফুটিত করলেন। এরপর কোভিড বিধি মেনে সকলেই ভগবানকে দোল দিতে লাগলেন। এইভাবে চারদিন অতিবাহিত হল। প্রতিদিন বিকালে পাঠপ্রবচন, কীর্তন ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল ও ভক্তদের মাঝে বিবিধ প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছিল।

পঞ্চমদিনে শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ১৭০ জন ভক্তকে হরিনাম দীক্ষা প্রদান করলেন। ঐদিন মন্দির প্রাঙ্গন শ্রীধাম মায়াপুরের মতো দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তদের, দীক্ষাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কীর্তনে এবং শ্রীমদ ভক্তিবিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজের দিব্য উপস্থিতিতে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল। শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ Zoom-এ প্রবচন ও দীক্ষা প্রদান করেন। ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজও প্রবচন প্রদান করেন। তিনটি চৈতন্য চরিতামৃত ও ৭টি ভাগবত গ্রন্থ প্রচার হয়। বলরামের আবির্ভাব উপলক্ষে পুষ্পাঞ্জলী ও মহারতি হয়। বিভিন্ন ভক্তরা বলরামের জন্য মধুভোগ অর্পন করেন ও ফুলের তৈরী রাখী ভগবানকে নিবেদন করেন। বিকালে পুনরায় ঝুলন উৎসব এবং ভক্তদের চোখ বেঁধে 'মধুভাণ্ড' ভাঙা উৎসব হয়। এইভাবে আনন্দ সহকারে আগত জন্মাষ্টমীর উৎসবে বাকি আনন্দকে উপভোগ করার আশা রেখে পাঁচদিনের ঝুলন উৎসব সমাপন হয়। সম্পূর্ণ উৎসব ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার হয়েছিল।

১৫০টিরও বেশী শিশু নববৃন্দাবন শিশু উৎসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো

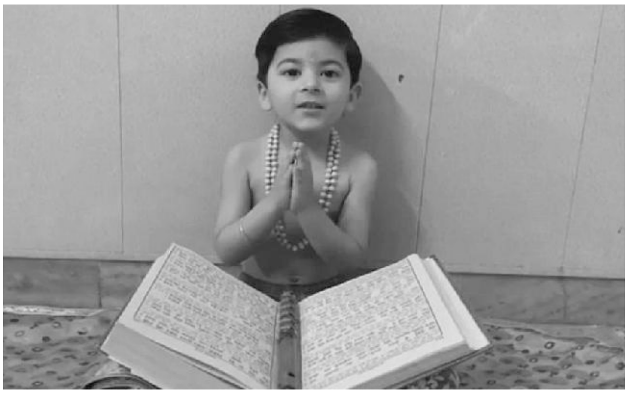

প্রায় ১৬০ জন শিশু নববৃন্দাবন শিশু উৎসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম পাঠিয়েছে, যা আগষ্ট মাসে পরিণত তিনটি মুখ্য বৈষ্ণব অনুষ্ঠানের উপর আলোকপাত করে যথা বলরাম জয়ন্তী, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এবং শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভাব দিবস। ফল ছিল খুব চিত্তাকর্ষক এবং গভীর উৎসাহ ব্যাঞ্জক।

অংশগ্রহণ আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। চার থেকে যোল বছর বয়সী শিশুরা যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, কানাডা এবং ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে নববৃন্দাবন ওয়েবসাইটে অনলাইন পঞ্জীকরণ করে।

সংগঠক তুলসী মঞ্জরী দাসী গোপাল গার্ডেন হোম স্কুলের শিক্ষিকা এবং নববৃন্দাবনে সাপ্তাহিক শিশু ক্যাম্প চালান। তিনি বলেন, "ধারণাটি হলো এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে শিশুদের উৎসাহিত করা এবং অর্চনা শেখানো।" কারণ তারা এতই মধুর এবং নিষ্পাপ যে তারা যাই করে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হয়ে ওঠে। এটি তাদের সঙ্গে আদান প্রদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে একটি সুযোগ প্রদান করে।

এই প্রতিযোগিতা ইসকনে নবাগত পরিবারের শিশুদের তিনটি মুখ্য বৈষ্ণব উৎসব সম্বন্ধে জানতে সুযোগ দেয় যাতে তারা প্রতিবছর এই উৎসবগুলি পালন করতে পারে।

শিশুদের চারটি বয়স ভিত্তিক শ্রেণী ছিল -- চার থেকে ছয় বছর, সাত থেকে দশ বছর, এগার থেকে চৌদ্দ বছর এবং চৌদ্দ থেকে যোল বছর। তারা চার মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি ভিডিও জ্ঞাপন করতে পারে যা গীত, নৃত্য, শ্লোক আবৃত্তি, নাট্যাংশ ইত্যাদি যেটি ঐ তিনটি মুখ্য উৎসবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তারা কবিতা, প্রবন্ধ অথবা কোন শিল্প কলাও জ্ঞাপন করতে পারে।

ব্রহ্মসংহিতা

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৩।।

গোলোক নাম্নি—গোলোক নামক; *নিজ ধাম্নি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম; *তলে চ তস্য*—এবং সেই গোলোক ধামের তলদেশে; *দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু*—দেবীধাম, মহেশধাম, হরি বা বৈকুণ্ঠ ধামে। *তেষু তেষু*—সেই সেই; *তে তে*—সেই সমস্ত; *প্রভাব নিচয়াঃ*—ধামোচিত শাস্ত্রাদি প্রসিদ্ধ প্রভাব সমূহ; *বিহিতাঃ চ*—এবং বিহিত হয়েছে; *যেন*—যাঁর দ্বারা; *গোবিন্দম্* —গোবিন্দকে; *আদিপুরুষ্*—আদি পুরুষকে; *তম্*—সেই; *অহং*—আমি; *ভজামি*— ভজনা করছি।

দেবীধাম, তার উপরে মহেশধাম, তার উপরে হরিধাম বা বৈকুণ্ঠ ধাম এবং সবার উপরে গোলোক নামক নিজধাম সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব সকল যিনি বিধান করেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

গোলোক নাম্নি নিজ ধাম্নি—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম গোলোক বৃন্দাবন। সমগ্র জগতকে চার ভাগ করলে তার একভাগ হচ্ছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জগৎ বা জড়জগৎ; এবং বাকী তিন ভাগ হচ্ছে অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ জগৎ বা চিন্ময় জগৎ। চিন্ময় আকাশের সর্বোচ্চলোক গোলোক। সমস্ত চিন্ময় লোকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধাম এই গোলোক ধাম। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত অসংখ্য কামধেনু, চিন্তামনি মন্দির সমন্বিত চিন্তামনি ধামে প্রেমপূর্ণচিত্ত অন্তরঙ্গগণ সঙ্গে মুরলীবদন মোহনসুন্দর গোপীজন বল্লভ বিরাজমান।

তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু—সেই গোলোক ধাম বৈকুণ্ঠ জগতের সবার উপরিভাগে অবস্থিত। আমরা আছি দেবী ধামে। অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া পরিচালিত জড় ব্রহ্মাণ্ডে আমরা জড়জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে চলেছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—মায়ার এই ত্রিগুণে বদ্ধ হয়ে নানাবিধ কর্ম করে চলেছি। কর্মবন্ধনে জড়িয়ে জন্মান্তর চক্রে ঘুরপাকও খাচ্ছি। বেশীর ভাগ জীবই রজোগুণে প্রভাবিত হয়ে এই জগতে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। অনন্তকাল ধরে এরকম মিথ্যা পাগলামিতে জীব কর্মচক্রে ভ্রমণ করছে এবং নাকানি চুবানি খাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না সে সাধু-মহাত্মার কৃপায় ভগবৎ-উন্মুখ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তার এই নানাবিধ জড় দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করতে করতে মায়ার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চক্রে ঘুরপাক খেতে হবে।

দেবী ধামের উপরে মহেশ ধাম বা শিবধাম। শিব ভুক্তিদাতা, মুক্তিদাতা, ভক্তদের ভগবৎভক্তি বর্ধনকারী। তিনি মুক্তসকলের পূজনীয় এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ। সর্ব

পুরুষার্থ শিরোমনি যে ভগবদ্‌ভক্তি, সেই ভক্তিবিশেষ বর্ধন করে থাকেন শিব। শিবের একনিষ্ঠ ভক্তগণ শিবলোকে থেকে পরমানন্দ ভরে সর্বদা শিবকে অবলোকন করেন। শিব সর্বদা নৃত্যগীত কৌতুক বিস্তার করে তাঁর ভক্তদের সুখী করে থাকেন। শিব নিত্যই প্রেমভরে সহস্রবদন শেষমূর্তি ভগবানের পূজা করে থাকেন। হরিভক্তি কীর্তনকারী ভক্তকে শিব বৈকুণ্ঠ ধামে প্রেরণ করেন।

হরিধাম বা বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মী-নারায়ণ রয়েছেন। ভগবদ্‌ভক্তির নয় রকমের অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির মধ্যে যে কোনও অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারাই বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। বৈকুণ্ঠে ভগবৎনিষ্ঠ বহু ভক্ত আছেন। সেখানে কোনও বিঘ্ন নেই। যদিও কখনও কখনও ভগবান বলেন, ভক্তরা যেখানে আমার গুণকীর্তন করে আমি সেখানেই থাকি, যোগীহৃদয়ে বা বৈকুণ্ঠে থাকি না। তবুও, ভগবান বিচিত্র সৌন্দর্য ও গুণলীলা মাধুর্য বিস্তার করে বৈকুণ্ঠের মতো আর অন্যত্র সর্বদা দৃষ্ট হন না। হরিধামে সহজেই নিত্য প্রেমভক্তিরসিক সমজাতীয় ভক্তগণের সংসর্গ লাভ হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় সর্ব বৈভব প্রকট করতে সমর্থ। তবুও, সেখানে কারও মাৎসর্য প্রভৃতি দোষ নেই। পরন্তু, সৌহার্দ্য বিনয় ও সম্মানাদি হাজার হাজার স্বাভাবিক গুণ বর্তমান এবং ঐ গুণগুলি নিত্য ও সত্য। পরস্পর সমভাবেই ছোট বড় লক্ষ লক্ষ রূপে নিজ নিজ প্রভুর সেবা করছেন।

তেষু তেষু তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন—সেই সেই ধামে, সেই সেই প্রভাব সমূহ শ্রীভগবানের দ্বারা বিহিত হয়েছে। যে সমস্ত জীবের যেরকম মনোভাব বা ভাবনাচিন্তা, সেই সমস্ত জীবের সেরকম মনোভাব বা ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী কোনও এক লোকে বাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন, ভগবানকে বাদ দিয়ে যারা নিজেরা ভোগ করে সুখী হতে চেয়েছিল, তাদের জন্যই জড় ব্রহ্মাণ্ড জগত তৈরি হয়েছে। সেই সমস্ত জীব মায়াদেবীর অধীনে জড় জগতে আবদ্ধ হয়েছে। এখানে এসে তারা আবার আমিই ভোগ করব, আমিই কর্তৃত্ব করব, আমিই সবার উপর প্রভুত্ব করব এরকম বাহাদুরীও শুরু করেছে। অবশ্য মায়াদেবীর ত্রিশূলও ঘাড়ে পড়ছে। কেউ যদি মায়াদেবীর জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্যোতিতে চুপচাপ মিশে যেতে চায়, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীকেও ভগবানের মায়াশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মজ্যোতিতে নিক্ষেপ করেন। যারা সাচ্চা শিবভক্ত, তারা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টা করছে, তারা শিবলোকে শিবের মতো শান্তভাবে থেকে সেগুলিও পেতে পারে। যারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্ভ্রম সহকারে সেবা করতে চান তাঁরা বৈকুণ্ঠ ধামে ঐশ্বর্যময় হরিধামে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করবেন, যাঁরা মাধুর্যময় গোলোক ধামের প্রতি অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি আসক্ত তাঁরা গোলোকে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী গোলোকবাসী ভক্তগণেরও বিচিত্র মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। গোলোকে কোটি কোটি বালক, তরুণ ও বয়স্ক গোপগণ বাস করেন। পরন্তু, তাঁরা সকলেই মনে করেন যে, আমিই শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রিয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই মতো ব্যবহারও করে থাকেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের প্রতি সেইরকম বিশুদ্ধ ব্যবহার করে থাকেন। ওই সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে কারও কিছুমাত্র কপটতা নেই। তবুও, কখনও কারও মনে তৃপ্তি লাভ হয় না। বরং উত্তরোত্তর প্রেমতৃষ্ণা বর্ধিতই হয়ে থাকে। কারণ, সেই প্রেমতৃষ্ণা থেকে দৈন্যই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানে কোটি কোটি গোপী বাস করছেন। প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরা-প্রীতি বর্তমান। আর, শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁদের প্রতি অনুরূপ কৃপা-আসক্তি বর্তমান। যদিও এই সমস্ত গোপী নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে পরম প্রেম বিশেষের সঙ্গে ক্রীড়া সুখ পরম্পরা সর্বদা অনুভব করে থাকেন, তবুও প্রেম স্বভাবে তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করে থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেম নেই। এইজন্য, প্রত্যেকেই চিন্তা করে থাকেন, আমার এমন কি সৌভাগ্য হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমায় অধমা দাসী বলে গণনা করবেন?

গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তম্ অহম্ ভজামি- বিভিন্ন ধামে বিভিন্ন প্রভাব বিধানকারী সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

– সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

দামোদর লীলার রহস্য

প্রেমাঞ্জন দাস

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মে ভগবান সম্পর্কে ধারণার মধ্যেও কিছু কিছু তারতম্য রয়েছে। যেমন খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মনে করেন যে ভগবান হচ্ছেন সকলের পিতা এবং তিনি একজন মহান ব্যক্তি। তেমনি মুসলমানেরাও মনে করেন যে আল্লাহ হচ্ছেন এক অতি মহান ব্যক্তি। এইভাবে সব ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে আবার পাশাপাশি অনেক গরমিলও রয়েছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এবং বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যে ভগবান সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অতি ব্যাপক এবং যুক্তি সঙ্গত ও অতি অদ্ভুত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে অন্যান্য ধর্মে ভগবানকে শুধু মহত্তম ও বৃহত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব তথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবান মহত্তম থেকে মহত্তর এবং ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর। অনুর অনীয়ান, মহত মহীয়ান। অন্যান্য ধর্মে ভগবানকে মহত্তম বলে স্বীকার করা হলেও তিনি যে ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর হতে পারেন, সেই তত্ত্বটি অনুভূত হয়নি।

দর্শন শাস্ত্রে তিন প্রকারের দর্শনের কথা শোনা যায় ঃ- তত্ত্ব (Thesis), বিপরীত তত্ত্ব (Anti-thesis) এবং এই উভয়ের সমন্বয় (Synthesis)। আমাদের বৈষ্ণব তথা সনাতন ধর্ম হচ্ছে এক প্রকার সমন্বয় তথা Synthesis। এই সমন্বয় মনুষ্য দ্বারা তৈরী হয়নি, এটি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। এই জন্য আমরা দেখি যে আমাদের সনাতন শাস্ত্রে সমস্ত পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ভগবানের মধ্যে একই সঙ্গে সহাবস্থান করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈশোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

তদ্‌ এজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।

যার অর্থ হল, তিনি চলেন, তিনি চলেন না। তিনি দূরের থেকেও দূরে, তিনি কাছের থেকেও কাছে। তিনি সব কিছুর অন্তরে অবস্থিত এবং সব কিছুর বাইরে অবস্থিত। এই কারণেই সারা পৃথিবী জুড়ে বেশীর ভাগ মানুষ বুঝতে পারে না যে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। যদি কেউ কৃষ্ণলীলা পাঠ করেন, তাহলে অধিকাংশ মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারেন না যে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। বেশীর ভাগ মানুষই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কৃষ্ণ অবিবাহিত গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছেন। কিংবা কৃষ্ণ যেমন পরস্ত্রীদের সাথে রাস নৃত্য করেছেন। এসব কথা শুনে সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন্ মানুষ বিভ্রান্ত না হবে? সাধারণ মানুষ অতি

সহজেই বিভ্রান্ত হবে। তাই বলা হয় যে, যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।

একজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন গুরু পরম্পরা ভুক্ত আচার্যদের টীকা পাঠ করেন এবং কৃষ্ণলীলার সুগভীর রহস্য বুঝতে পারেন, তখন তিনি আপাত বিরোধী এবং পরস্পর বিরোধী সমস্ত কৃষ্ণলীলার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যেমন আমরা জানি যে ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। কিন্তু ভগবান আবার সবচেয়ে দুর্বল। তা কি করে সম্ভব? যিনি সর্ব শক্তিমান, তিনি কি করে অতি দুর্বল হবেন? যশোদা নামের এক মহিলা কি করে সর্ব শক্তিমান ভগবানকে বেঁধে ফেলতে পারেন? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে কৃষ্ণ এখানে খুব দুর্বল। তাহলে বেশির ভাগ মানুষ কি করে বুঝতে পারবে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান? এক স্ত্রী যাকে বেঁধে ফেলতে পারেন, তিনি কি করে সর্ব শক্তিমান ভগবান হতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সর্ব শক্তিমান ভগবান। কিন্তু ভগবানের যে প্রেম তথা কৃষ্ণপ্রেম, তা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছেঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

(ভাগবত ১/২/৬)

সেই ধর্ম হচ্ছে মানুষের পরম ধর্ম যাতে মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের প্রতি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহত ভক্তিলাভ করে, যার দ্বারা মানুষের আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।

তাই সিদ্ধান্ত হল যে প্রেম ভগবানকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। একজন ভক্ত আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনারা বলেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু কখনো বা রাধারানী কিংবা মা যশোদা ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাহলে আপনারা তো যোগমায়াকে ভগবান বলতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, যোগমায়া যে কৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কৃষ্ণ স্বয়ং যোগমায়াকে প্রদান করেন। মায়াবাদীরা বলেন যে ভগবান মহামায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। কিন্তু আমরা যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী তথা বৈষ্ণব, আমরা বলি যে ভগবান যোগমায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। মহামায়া শুধু সেই সব লোকদের নিয়ন্ত্রণ করেন যারা ভগবানের মতো ভোগ বিলাস করতে চায়। কিন্তু যোগমায়া শুধু তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন যাঁরা প্রেমভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার ইচ্ছা করেন। সেই কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে এক পরম পবিত্র বস্তু এবং যখন যোগমায়া সেই প্রেমকে নিয়ন্ত্রণ করেন তখন স্বয়ং ভগবানও সেই যোগমায়ার নিয়ন্ত্রণে থাকতে চান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে হাতে সেই প্রেমকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা power of attorney হিসাবে যোগমায়ার হাতে তুলে দেন। সেজন্যই যোগমায়ার ক্ষমতা তথা কৃষ্ণপ্রেমের ক্ষমতা সর্ব শক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বেশী। যারা সনাতন শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তটি বুঝতে পারেন না, তারা কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলারহস্য বুঝতে পারবেন না।

মা যশোদা যেভাবে কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন, তা হল এই সিদ্ধান্তের একটি অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত যা থেকে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে ভগবান প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই লীলাতে আমরা দেখি যে ভগবান খুব দুর্বল। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে এটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি সর্বোচ্চ গুণ। ভগবান সর্ব শক্তিমান গুণটির থেকে তিনি যে প্রেমের কাছে দুর্বল, এই গুণটিই অধিক মহত্ত্বপূর্ণ।

যশোদা নামটির মধ্যে দুটো শব্দ রয়েছেঃ যশ এবং দা। দা মানে দান করেন। যিনি ভগবানকে পর্যন্ত যশ দান করেন তিনিই হলেন যশোদা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা এক সর্বোত্তম যশ দান করেছিলেন, যা ভগবানের অন্য সকল যশকে পর্যন্ত হার মানায়। অর্থাৎ ভগবান সর্বশক্তিমান ইত্যাদি যশের থেকেও প্রেমের কাছে তাঁর দুর্বলতা অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ।

> মা যশোদাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণকে আরও ভালোভাবে সেবা প্রদান করার জন্য সেই দুধের সংরক্ষণ করা বিশেষ ভাবে দরকার। তিনি তাই কৃষ্ণকে তাঁর কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে সেই উথলে উঠা দুধকে বাঁচাতে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রেগে গেলেন।

ভগবান সম্পর্কে এই যে ধারণা, যে তিনি ভক্তের প্রেমের বশীভূত, তা সনাতন ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে, যেমন ইসলাম বা খৃস্টান প্রমুখ ধর্মে এত সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায় না।

মা যশোদা কর্তৃক এই দাম বন্ধন লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দীপাবলি মহোৎসবের তিথিতে। যদিও এই লীলা বৃন্দাবনে ভক্তদের সামনে আপাত বিচারে মাত্র এক দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ভক্তরা আজও তা পরম উৎসাহের সঙ্গে এক মাস ধরে উদযাপিত করে। বৈষ্ণব পরম্পরার মহাজনগণ, টানা একমাস ধরে মহোৎসবের অনুমোদন করেছেন যাতে ভক্তরা ভগবান যে প্রেমের বশীভূত, ভগবানের এই সর্বোচ্চ

গুণটির মহত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে। এ থেকেই এই লীলার গুরুত্ব কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

এখন আমরা সংক্ষেপে এই লীলার বর্ণনা শ্রবণ করব যাতে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে ভগবান প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

ইন্দ্র পূজার এক দিন আগের ঘটনা। নন্দ মহারাজের বাড়িতে তখন পূজার প্রস্তুতি চলছে। কৃষ্ণ তখন শিশু রূপে লীলা করছেন। তিনি মা যশোদার সঙ্গে শুয়ে আছেন। ঐ সময় গোবর্ধন পূজা প্রকট হয়নি। নন্দ বাবা, মা যশোদা এবং তাঁদের সকল দাস দাসী ইন্দ্র পূজার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে তা সত্ত্বেও যশোদা আরও দু'চার জন দাস দাসী নিজের কাছে রাখতেই পারতেন। কিন্তু যশোদা অন্য কোনো দাস দাসীকে নিজের সঙ্গে রাখেননি তার কারণ হচ্ছে সেটি ছিল প্রেমমূলক সেবা এবং মা যশোদা নিজের হাতে সব কিছু করতে চেয়েছিলেন।

মা যশোদা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দধি মন্থন করে মাখন তোলার কাজ শুরু করলেন। কৃষ্ণ যখন ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে মা তাঁর পাশে নেই। তিনি একজন নিখুঁত শিশুর মতোই লীলা করছিলেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বসে তাঁর চোখ দুটো একটু রগড়ে নিলেন এবং খাট থেকে নেমে মাকে খুঁজতে শুরু করলেন। সাধারণ শিশু যেমন মাকে কাছে না পেলে অসন্তুষ্টি বোধ করে, তিনিও সেরকম অসন্তুষ্ট হলেন। আর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর সেই অসন্তোষ ছিল স্বাভাবিক। এমন নয় যে তিনি কৃত্রিমভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ মা যশোদার কাছে গিয়ে তাঁর দধি মন্থনের দণ্ডটি ধরলেন এবং মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার জন্য বায়না ধরলেন। মা যশোদাও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং খুব জোরে জোরে দধি মন্থন করছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যখন সেই দণ্ডটি ধরে ফেললেন, মা আর সেটি একটুও নাড়তে পারলেন না। মা যশোদা তখন বুঝতে পারলেন যে আমার সন্তানটি বয়সে ছোট হলেও বেশ শক্তিশালী। এটা বুঝতে পেরে মা খুব খুশি হলেন যে আমার শিশুটি খুবই শক্তিশালী। মা যশোদার হৃদয় অফুরন্ত বাৎসল্য রসে ভরে উঠল। তিনি কৃষ্ণকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে অসীম পরিমাণে দুধ খাওয়াতে লাগলেন।

মা যশোদা ছিলেন এক অত্যন্ত পারদর্শী মহিলা। তিনি একই সঙ্গে একাধিক কাজ করছিলেন। যেমন দধি মন্থন, পাশাপাশি দুধ জ্বালানো যাতে কৃষ্ণকে প্রয়োজন পড়লে আরও গো দুগ্ধ খাওয়াতে পারেন এবং আগামীকালের জন্য আরও দই পেতে মাখন তুলতে পারেন। হঠাৎ করে চুলায় বসানো দুধ উথলে উঠে আগুনে পড়তে শুরু করল। এটা দেখে মা ভাবতে লাগলেন যে এই দুধ কোনো সাদারণ দুধ নয়। পদ্মগন্ধা নামে কিছু সুনির্বাচিত গাভী থেকে সংগ্রহ করা এই দুধ শুধু কৃষ্ণের জন্যই জ্বালানো হচ্ছিল। তাই কৃষ্ণসেবার জন্যই এই দুধের সংরক্ষণ প্রয়োজন ছিল। ভক্তদের কাছে সেবার গুরুত্ব এত বেশী যে সময় তাঁরা জাগতিক বিধি নিয়ম ভেঙ্গেও ভগবানের সেবা করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর একটি বিশেষ লীলায় আমরা দেখি যে উনার সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুর গাত্র মর্দন করার জন্য তাঁর দিব্য শরীরের উপর এক খণ্ড বস্ত্র রেখে মহাপ্রভুর দিব্য দেহ ডিঙ্গিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন। সেবা এতই গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্রে আছে যে গোপীরা যখন কৃষ্ণকে ময়ূর পাখা দিয়ে বাতাস করতেন, অনেক সময় অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের জন্য তারা ঠিক মতো কৃষ্ণের সেবা করতে পারতেন না। তাঁরা তখন প্রার্থনা করতেন যে দিব্য আনন্দ প্রসূত এই সমস্ত অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার যেন তাঁদের দেহে জাগ্রত না হয়, যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে কৃষ্ণ সেবা করতে পারেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দিব্য আনন্দ আস্বাদনের থেকেও সেবা প্রদানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

মা যশোদাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণকে আরও ভালোভাবে সেবা প্রদান করার জন্য সেই দুধের সংরক্ষণ করা বিশেষ ভাবে দরকার। তিনি তাই কৃষ্ণকে তাঁর কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে সেই উথলে উঠা দুধকে বাঁচাতে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রেগে গেলেন। কেন মা আমাকে মাটিতে রেখে দৌড়ে গেলেন? প্রেম মানে মনোযোগ বা ধ্যান প্রদান করা। কিন্তু মা কেন আমাকে অবহেলা করলেন? কৃষ্ণ তখন একটি শিল নোড়ার পাথর তুলে নিলেন এবং পার্শ্ববর্তী সেই দধি ভাণ্ডে আঘাত করে সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। ভগবান তখন বুঝতে পারলেন যে আমি এখন অপরাধী। এখনই মা আসবেন এবং আমাকে শাস্তি দেবেন। তিনি তখন দৌড়াতে শুরু করলেন। য পলায়তি সঃ জীবতি।

মা যশোদা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি আমার আদরের দুলালের কাজ। কৃষ্ণ প্রথমে মাটিতে পড়া দইয়ের উপর পা রেখেছিলেন এবং সেই দধি সিক্ত পায়ের ছাপ দেখে মা যশোদা কৃষ্ণের গমন পথ বুঝতে পেরেছিলেন। ঐ সমস্ত পদচিহ্ন অনুধাবন করে মা যশোদা কৃষ্ণকে আবিষ্কার করলেন। কৃষ্ণ তখন শিকায় ঝুলিয়ে রাখা কিছু পুরানো মাখন খাচ্ছিলেন এবং বানরদের মধ্যেও তা বিতরণ করছিলেন। বানরগুলি আকণ্ঠ মাখন খেয়ে আর খেতে পারছিল না। গোস্বামীগণ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ভগবান যখন

রামলীলায় বানরদের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি ওই সব বানরদের ভাল করে খাওয়াতে পারেননি। কৃষ্ণলীলায় তিনি তাই বানরজাতির প্রতি সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা করছিলেন। মা যশোদা যখন দেখলেন যে কৃষ্ণ বানরদের মাখন খাওয়াচ্ছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি লাঠি তুলে নিলেন। কৃষ্ণ তাতে ভয় পেয়ে গেলেন এবং আপাত দৃষ্টিতে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আবার দৌড়াতে শুরু করলেন। কৃষ্ণলীলা এতই বিভ্রান্তিকর যে এরকম একজন ভীতু শিশু যে কি করে সর্বশক্তিমান ভগবান হবেন, তা উপলব্ধি করা সত্যিই খুব রহস্যময়। বলা হয় যে—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ বপতে ভিষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।
(তৈত্তিরিয় উপঃ ২/৮)

অর্থাৎ কৃষ্ণের ভয়ে বায়ুর দেবতা পবনদেব বায়ু প্রবাহিত করছেন। সূর্যদেব কৃষ্ণের ভয়ে সঠিক সময়ে উদিত হচ্ছেন। অগ্নিদেব ও চন্দ্রদেব কৃষ্ণের ভয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমন কি মৃত্যুর দেবতা যমরাজ পর্যন্ত এই কৃষ্ণের ভয়ে পঞ্চম গতিতে ধাবিত হচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে সমস্ত দেবতারা যার ভয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন, এই সেই শ্রীকৃষ্ণ যিনি মা যশোদার ভয়ে ধাবিত হচ্ছেন। এই বিভ্রান্তিকর রহস্যের মূল সমাধান হল কৃষ্ণ প্রেম। এই সবই ভগবান করছেন প্রেমের বশীভূত হয়ে। জড় জগতেও আমরা দেখি যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা যারা VIP দের ভয় পান না, তারাও নিজের মাকে সমীহ করে চলেন। এই হচ্ছে প্রেমের ক্ষমতা।

মা যশোদার শরীর ছিল ভারী। তিনি আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছিলেন। মায়ের ক্লান্তি দেখে কৃষ্ণের দয়া হল। তিনি মনস্থ করলেন যে মার কাছে ধরা দেবেন। পিছন ফিরে তাকাবার অছিলায় তিনি যেই মুখ ঘোরালেন, মা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন। যে কৃষ্ণকে মুনি পুঙ্গবেরা মনের গতিবেগে লক্ষ কোটি বছর দৌড়েও ধরতে পারেন না, তিনি ধরা পড়লেন তাঁর প্রেমময়ী মায়ের প্রেমের বন্ধনে। মা যশোদার হাতে কৃষ্ণসেবার জন্য অনেক কাজ পড়ে ছিল। কৃষ্ণ যদি ভয় পেয়ে বনে চলে যায়, বন্য পশুরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। তাঁর বাড়িতে নয় লক্ষ গাভী ছিল। তাঁর কোনও দড়ির অভাব ছিল না। দু চারটা দড়ি নিয়ে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে মনস্থ করলেন এবং বাঁধার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু যতবারই তিনি বাঁধার চেষ্টা করলেন, ততবারই দড়ি দুই আঙ্গুল কম পড়ছিল। মা যশোদা বার বার বহু দড়ি জোড়া দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করলেন। বহু গোপী মজা দেখতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তারাও মা যশোদাকে দড়ির জোগান দিচ্ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঐ সমস্ত গোপীদের লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই দুই আঙ্গুল দড়ি কম হচ্ছিল। এই ভাবে আপাত ভীতু কৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বর ভাব প্রমাণ করেছিলেন। সেখানে গোপীশ্রেষ্ঠা রাধাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক থেকে তাঁর ফিতা খুলে দিলেন। মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম আর শ্রীরাধার মাধুর্য প্রেমের শক্তিতে অবশেষে কৃষ্ণ বাঁধা পড়লেন এক উদুখলে।

নারদ মুনির অভিশাপে কুবেরের পুত্রদ্বয় দুটি অর্জুন গাছ হয়ে নন্দ মহারাজের প্রাঙ্গনে বিরাজ করছিলেন। স্বয়ং বন্দী কৃষ্ণ তাদের বন্ধন দশার কষ্ট অনুভব করলেন। দুটো গাছের মাঝে প্রবেশ করে হেঁচকা টান দিতেই দুটো গাছ উপড়ে পড়ল মাটিতে। এইভাবে নলকুবের ও মনিগ্রীব মুক্তি পেলেন। কৃষ্ণকে অনেক প্রার্থনা নিবেদন করে তাঁরা স্বস্থানে বিদায় নিলেন।

সেদিন বলরাম ও তাঁর মা রোহিনী উপানন্দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কৃষ্ণকে বন্দী দেখে খুব ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগলেন। বলরাম গর্জন করে বললেন, কার এত সাহস যে আমার ভাই, যিনি স্বয়ং ভগবান, তাকে বাঁধার সাহস করে। আমি নিজেও স্বয়ং অনন্ত শেষ। আমি স্বয়ং সঙ্কর্ষণ ভগবান। যে আমার ভাইকে বেঁধেছে, আমি তাকে ধ্বংস করে দেব। মা যশোদা এসব শুনে হাতে লাঠি নিয়ে গর্জন করে বললেন, সব ভগবানগুলি কি আর কোথাও জায়গা পায়নি। সব আমার বাড়িতে কেন? মা যশোদার হাতে লাঠি দেখে বলরামও পালিয়ে গেলেন। কৃষ্ণও কাঁদতে লাগলেন। প্রেমের কাছে ভগবান এতই দুর্বল! এতই অসহায়!

প্রহারেণ ধনঞ্জয়

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

উপদেশঃ

অন্যেরা যারা বুদ্ধিমান তারা যখন দেখল যে তাদের প্রতি অপমানজনক আচরণ করা হচ্ছে তখন তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করল। শেষের জন ছিল মূর্খ। সে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হয়েছিল এবং তারপর সে সেই স্থান পরিত্যাগ করেছিল। সুতরাং জড়জগতের আচরণটিও অনুরূপ পদাঘাত। কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে আমরা বলি, "ওহ! কত মধুর পদাঘাত।"

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

কৃষ্ণায় মেঘপুযে চপলাম্বরায়
পীযুষমিষ্টবচনায় পরাৎপরায়।
বংশীধরায় শিখিচন্দ্রকয়ান্বিতায়
দেবায় ভ্রাতৃসহিতায় নমোহস্তু তস্মৈ।।১।।

মেঘ কলেবর, চঞ্চল অম্বর, অমৃত সুমিষ্ট ভাষী।
পিকপুচ্ছ চুড়, দারুণ সুন্দর, করযুগে প্রিয় বাঁশী।।
যে পরমেশ্বর, সঙ্গে সহচর, ভ্রাতা শ্রীবলরাম।
সে শ্রীকৃষ্ণদেবে, সুবিনীতভাবে,করি সদা পরণাম।।১।।

কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ পুরুযোত্তমঃ স্বয়ং
পূর্ণ পরেশ প্রকৃতেঃ পরো হরিঃ।
যস্যাবতারাংশকলা বয়ং সুরাঃ
সৃজাম বিশ্বং ক্রতোহস্য শক্তিভিঃ।।২।।

শ্রীপুরুযোত্তম, সর্বশ্রেয়োতম, পরম পুরুষ হরি।
তব কৃপা গুণে, মোরা দেবগণে, সংসার সৃজন করি।।
তব শক্তি বলে, মোরা যে সকলে, হঞাছি শকতিমান।
কলা অবতার, আমরা তোমার, তুমিই মোদের প্রাণ।।২।।

স ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারো
নন্দস্যাপি পুত্রতামাগতঃ কৌ।
বৃন্দারণ্যে গোপবেশেন বৎসান্
গোপৈর্মুখ্যেশ্চারয়ন্ ভ্রাজসে বৈ।।৩।।

পরম ঈশ্বর, হে শ্যামসুন্দর, পৃথিবীতে নন্দসূত।
গোপগণ সাথে, রাখাল ভাবেতে, গোচারণে হও রত।।
বৃন্দাবনে বনে, প্রিয় সখা সনে, তুমি যে বিরাজ করো।
হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শুভানন্দ সান্দ্র, প্রতিক্ষণে তোমা স্মরো।।৩।।

হরিং কোটিকন্দর্পলীলাভিরামং
স্ফুরৎকৌস্তুভং শ্যামলং পীতবস্ত্রম্।
ব্রজেশস্তু বংশীধরং রাধিকেশং
পরং সুন্দরং তং নিকুঞ্জে নমামি।।৪।।

শ্যামল বরণ, সুপীত বসন, কৌস্তুভ ভূষণ শোভা।
বংশীধর রূপ, অতি অপরূপ, কোটি কামমনোলোভা।।
ব্রজের আনন্দ, তুমি প্রেমানন্দ, তুমি শ্রীরাধিকানাথ।
নিকুঞ্জবিহারী, সুন্দর শ্রীহরি, তব পদে প্রণিপাত।।৪।।

যাবন্মনশ্চ রজসা প্রবলেন বিদ্বন্
সংকল্প এব তু বিকল্পক এব তাবৎ।
তাভ্যাং ভবেন্মনসিজস্ত্বভিমানযোগ-
স্তেনাপি বুদ্ধিবিকৃতিং ক্রমতঃ প্রয়ান্তি।।৫।।

যখনি হৃদয়ে, রজোভাব উদয়ে, কত কিনা করে বসি।
কভু সংকল্পে, কভু বিকল্পে, জাগে অভিমান রাশি।।
অভিমানে যত, সুবুদ্ধি বিকৃত, তাহে ভাবি কর্তা আমি।
প্রণমি সর্বজ্ঞ, আমি বড়ো অজ্ঞ, তুমি যে পরম স্বামী।।৫।।

বিদ্যুদ্দ্যুতিস্ত্বতুগুণো জলমধ্যরেখা
ভূতোল্মুকঃ কপটপান্থরতির্যথা চ।
ইত্থং তথাস্য জগতস্তু সুখং মৃষেতি
দুঃখাবৃতং বিষয়ঘূর্ণমলাতচক্রম্।।৬।।

ক্ষণিক যেমত, চমকে বিদ্যুত, যেমত ঋতুর গতি।
জলমধ্য রেখা, পিশাচাগ্নি শিখা, কপট পথিক রতি।
জগতের সুখ, তেমত ক্ষণিক, স্বপ্নসম মিছা মানি।
সুখ পাশাপাশি, কত দুঃখরাশি, অলাতচক্র সে জানি।।৬।।

জ্ঞানী বিসৃজ্য মমতামভিমানযোগং
বৈরাগ্যভাব রসিকঃ সততং নিরীহঃ।
দীপেন দীপকশতঞ্চ যথা প্রজাতং
পশ্যেত্তথাত্মবিভবং ভুবি চৈকতত্ত্বম্।।৭।।

জগত বিষয়ে, জ্ঞান যার রহে, করে না মমতা জ্ঞান।
সদা তোমা প্রতি, করে রতিমতি, ছাড়ি জড় অভিমান।।
এক দীপ হতে, বিস্তরে যেমতে, শত শত উদ্দীপন।
বহুত জীবাত্মা, এক পরমাত্মা, তোমা করি দরশন।।৭।।

ভক্ত ভজেদ্ব্রজপতিং হৃদি বাসুদেবং
নির্ধূমবহ্নিরিব মুক্তগণঃ স্বভাবঃ।
পশ্যন্ ঘটেষু সজলেষু যথেন্দুমেক-
মেতাদৃশঃ পরমহংসবরঃ কৃতার্থঃ।।৮।।

স্থির জলে চাঁদ, তোমা জগমাঝ, সদা দেখে সুধী জনে।
সুস্থির নির্গুণ, আত্মনিষ্ঠ জন, তোমা দেখে প্রতিক্ষণে।।
কুণ্ঠা ধূম নহে, সুদীপ্ত হৃদয়ে, সেবে তোমা প্রেম ভরে।
হে শ্রীবাসুদেব, ভক্তগণ সব, তোমার ভজনা করে।।৮।।

স্তুবন্তি বেদাঃ সততঞ্চ যং সদা-
হরের্মহিম্নঃ কিল ষোড়শীং কলাম্।
কদাপি জানন্তি ন তে ত্রিলোকে
বক্তুং গুণাংস্তস্য জনোহস্তি কঃ পরঃ।।৯।।

সদা বেদগণ, করিয়া কীর্তন, তোমার মহিমা কথা।
ষোড়শ ভাগের, একটি ভাগের, প্রকাশ হয় না তথা।।
এই ত্রিভুবনে, কেবা তোমা জানে, কে করে তোমার গান।
অতি ছিটেফোঁটা, শুনি কোনো কথা, তাহে কত অভিমান।।৯।।

বৈকুণ্ঠলীলাপ্রবরং মনোহরং
নমস্কৃতং দেবগণৈঃ পরং বরম্।
গোপাললীলাভিযুতং ভজাম্যহং
গোলোকনাথং শিরসা নমাম্যহম্।।১০।।

চিদানন্দবর, সর্বমনোহর, তুমি লীলাময় হরি।
সর্বদেবগণ, প্রণমিত হন, তোমার চরণ স্মরি।।
গোপশিশুরূপে, খেলা করো এবে, তোমায় প্রণাম করি।
হে গোলোকপতি, মোর এ মিনতি, দাও দোষ ক্ষমা করি।।১০।।

ঘোষেষু বাসিনামেষাং ভূত্বাহং ত্বৎপদাম্বুজম্।
যাদ ভজেয়ং সুগতিস্তদা ভূয়ান্ন চান্যথা।।
বয়ন্তু গোপদেহেষু সংস্থিতাশ্চ শিবাদয়ঃ।
সকৃৎ কৃষ্ণস্তু পশ্যাস্তস্তস্মাদ্ধন্যশ্চ ভারতে।।১১।।

ভারতবরষে, ব্রজপুরে এসে, জনম লভিব আমি।
তোমার চরণ, করিয়া ভজন, থাকিব দিবসযামী।।
শিব, আমি সবে, আসি এই ভবে, গোপকুলে জনমিব।
শ্রীমন্ বৃন্দাবনে, তোমা দরশনে, জীবন ধন্য করিব।।১১।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?
পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
9073791237
বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন না পেলে রেজিস্টার্ড পোস্টে পরিবর্তন করা যেতে পারে।